অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
ষোলো নম্বর
ফটিক ঘোষ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ষোল নম্বর
ফটিক ঘোষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

‘‘রা স্বা’
বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম
শ্রীমতী শতাব্দী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায় কল্যাণীয়াসু

রাসপুরের খালের ধারে এসে থমকাল ফটিক। খালের ওপর একখানা জরাজীর্ণ বাঁশের সাঁকো। পেছনে নিতাই। ফটিক তার দিকে ফিরে বলল, “ও নিতাই, হয়ে গেল।”

“হলটা কী?”

“এই সাঁকো পেরোতে হলে হনুমান হতে হয়। অবস্থা দেখছিস!”

বাস্তবিক সাঁকোর অবস্থা খুবই কাহিল। পেরনোর জন্য দুখানা বাঁশ পাতা আছে। বাঁ পাশে একটা বাঁশের রেলিং। কিন্তু পেতে রাখা বাঁশের একখানা মাঝখানে মচাত হয়ে ঝুলছে। রেলিংয়ের বাঁশ কেতরে আছে। নীচে শেষ বর্ষার জলে খাল টইটমুর বেশ স্রোতও আছে।

দমে গেলেও নিতাই সবসময়েই আশাবাদী। বলল, “চল, পেরনোর চেষ্টা তো করি। জলে পড়ে গেলে সাঁতরে চলে যাব।”

“কী বুদ্ধি তোর! আমি কি সাঁতার জানি নাকি? তার ওপর টিনের সুটকেস আর পোটলা রয়েছে সঙ্গে, জলে পড়লে সব নষ্ট।”

আশাবাদী নিতাই এবার চিন্তায় পড়ল। খালটা পেরনো শক্তই বটে। বেশি বড় নয়, হাত পনেরো চওড়া খাল। কিন্তু লাফ দিয়ে তো আর ডিঙোনো যায় না। রাসপুরের লোকজনের কাছে তারা পথের হদিস জানতে চেয়েছিল। তারা দোগেছে যাবে শুনে লোকগুলো প্রথমটায় এমন ভাব করল যেন নামটাই কখনও শোনেনি। একজন বলল, “দোগেছে! সেখানে কেউ যায়!” আর একজন বলল, “দোগেছে যাওয়ার চেয়ে বরং বাড়ি ফিরে গেলেই তো হয়।” যাই হোক অবশেষে একজন বলল, “বেলাবেলি পৌঁছতে হলে বটতলা দিয়ে রাসপুরের খাল পেরিয়ে যাওয়াই ভাল। তবে কাজটা কঠিন হবে।” কেন কঠিন হবে তা আর ভেঙে বলেনি।

ফটিক পা দিয়ে সাঁকোটা একটু নেড়ে দেখল। একটু নাড়া খেয়েই সাঁকোতে যেন ঢেউ খেলে গেল।

ফটিক পিছিয়ে এসে বলল, “অসম্ভব।”

নিতাই মৃদুস্বরে বলে, “একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। ব্যালান্সটা ঠিক রাখতে পারলে পেরোনো যায়।”

খালের ওপারে একটা বটগাছ। তার ছায়ায় একটা লোক উবু হয়ে বসে ছিল। এবার উঠে এগিয়ে এসে বলল, “কী খোকারা, খাল পেরোবে নাকি?”

নিতাই বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু কী করে পেরোব?”

“কেন, ওই তো সাঁকো। সবাই পেরোচ্ছে।”

“পেরোচ্ছে! পড়ে যায় না?”

“তা দু-চারটে পড়ে। আজ সকালে হর ডাক্তার আর বৃন্দাবন কর্মকার পড়ল। দুপুরে পড়ল নব মণ্ডল, সীতারাম কাহার আর ব্রজ দাস। বরাতজোর থাকলে পেরিয়েও যায় কেউ কেউ।”

“না মশাই, আমরা ঝুঁকি নিতে পারব না। সঙ্গে জিনিসপত্তর আছে। আচ্ছা, খালে জল কত?”

লোকটা মোলায়েম গলায় বলে, “বেশি না, বড়জোর ছ-সাত হাত হবে। সাঁতার দিয়েও আসতে পারো। তবে—” বলে লোকটা থেমে গেল।

নিতাই বলল, “তবে কী? জলে কুমিরটুমির আছে নাকি?”

লোকটা অভয় দিয়ে বলল, “আরে না। এইটুকুন খালে কি আর কুমির থাকে? তবে দু-চারটে ঘড়িয়াল আর কামট আছে বটে। তা তারা তো আর তোমাদের খেয়ে ফেলতে পারবে না। বড়জোর হাত বা পায়ের দু-চারটে আঙুল কেটে নেবে, কিংবা ধরো পেট বা পায়ের ডিম থেকে এক খাবলা করে মাংস। অল্পের ওপর দিয়েই যাবে অবশ্য। আজ সকালেই হরবাবুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা গেল কিনা।”

ফটিক ফ্যাকাসে মুখে বলল, “বলে কী রে লোকটা!”

লোকটা বলল, “জোঁক আর সাপের কথা তো ধরছিই না হে বাপু রাসপুরের খাল পেরোতে হলে অতসব হিসেব করলে কি চলে?”

নিতাই বলল, “অন্য কোনও উপায় নেই পেরোনোর?”

“তা থাকবে না কেন? আড়াই মাইল উত্তরে গেলে উদ্ধবপুরে খেয়াঘাটের ব্যবস্থা আছে। আরও এক মাইল উজিয়ে হরিমাধবপুরে পাকা পোল পাবে।”

“তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, বেলাবেলি এক জায়গায় পৌঁছতে হবে। একটা উপায় হয় না?”

লোকটা খুব চিন্তিত মুখে বলল, “দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। উপায় ভাবতে তো একটু সময় দেবে! পরের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই আমার সময় চলে যায়, নিজের ভাবনা আর ভাবার ফুরসতই হয় না।”

“একটু তাড়াতাড়ি ভাবলে ভাল হয়। আমাদের খিদেও পেয়েছে কিনা।”

লোকটা খ্যাক করে উঠল, “ওঃ, খিদে তেষ্টা যেন শুধু ওদেরই পায়! আমার পায় না নাকি? ওরে বাপু, খিদে-তেষ্টা পায় বলেই তো জগতের এত সমস্যা। তা তোমাদের কাছে কি গুটিপাঁচেক টাকা হবে।”

ফটিক আশায় আশায় বলল, “তা হবে।”

“বাঃ, বেশ! তা হলে বাঁ ধারে বিশ পা হেঁটে ওই যে ঝোপঝাড় দেখছ, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।”

ঝোপঝাড়ের দিকে চেয়ে ফটিক সন্দিহান গলায় বলল, “সাপটাপ নেই তো!”

লোকটা নিরুদ্বেগ গলায় বলল, “তা থাকবে না কেন? বর্ষার সময় এখনই তো তারা বেরোয়। আছেও নানারকম। গেছো সাপ, মেছো সাপ, কালকেউটে, গোখরো, চিতি, বোড়া। কত চাই?”

“ও বাবা।”

“আহা, অত ভাবলে কি চলে! সাপেদেরও নানা বিষয়কর্ম আছে। শুধু মানুষকে কামড়ে বেড়ালেই তো তাদের চলে না। পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। একটু দেখেশুনে পা ফেলো, তা হলেই হবে।”

নিতাই বলল, “চল তো, অত ভয় পেলে কাজ হয় না।”

অগত্যা দু'জনে গুটিগুটি গিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢুকল। কাঁটা গাছ, বিছুটি কোনওটারই অভাব নেই।

চেক লুঙ্গি আর সবুজ জামা পরা বেঁটে লোকটা জলের ধারে এসে খোঁটায় বাঁধা একটা দড়ি ধরে টান দিতেই দড়িটা জল থেকে উঠে এল আর দেখা গেল, দড়ির একটা প্রান্ত এপাশে একটা ছোট নৌকোর সঙ্গে বাঁধা। ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকোনো ছিল বলে নৌকোটা দেখা যাচ্ছিল না।

"নাও হে, উঠে পড়ো। পরের উপকার করতে করতে গতরে কালি পড়ে গেল।"

ফটিক আর নিতাই আর দেরি করল না। জলের ধারে নেমে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে পড়ল। লোকটা দড়িটা টেনে লহমায় তাদের খালের ওপারে নিয়ে ফেলল।

লোকটা একগাল হেসে বলল, "তায়েবগঞ্জের হাটে যাবে বুঝি?

তা আর শক্ত কী ? ওই ডান ধারের রাস্তা ধরে গুটিগুটি চলে যাও, মাইল দুই গেলেই খয়রা নদীর ধারে বিরাট হাট। জিনিসপত্র বেজায় শস্তা। আটাশপুরের বিখ্যাত বেগুন, গঙ্গারামপুরের নামকরা ঝিঙে, সাহাপুরের কুমড়ো, তার ওপর নয়ন ময়রার জিবেগজা তো আছেই।"

ফটিক বলল, "না মশাই, আমরা তায়েবগঞ্জের হাটে যাব না। অন্যদিকে যাব।"

লোকটা হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বলল, "কেন, তায়েবগঞ্জের হাটটা কি কিছু খারাপ জায়গা নাকি? ক ত জজ ব্যারিস্টার ও হাট দেখতে আসে তো তোমরা তো কোথাকার পুঁচকে ছোকরা। এখন পাঁচটা টাকা ছাড়ো দেখি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নিতাই ফস করে বলে উঠল,"খেয়াপাড়ের জন্য পাঁচ টাকা ভাড়া নিচ্ছেন! এ তো দিনে ডাকাতি। ওই পুঁচকে খাল পেরোনোর ভাড়া মাথাপিছু পঁচিশ পয়সা হলেই অনেক।"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "খেয়াপারের ভাড়া চাইছি কে বলল? ছিঃ ছিঃ, ওইসব ছোটখাটো কাজ করে বেড়াই বলে ভাবলে নাকি? এই মহাদেব দাস ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না হে।"

"তবে পাঁচ টাকা নিলেন যে!"

"সেটা তো আমার মাথার দাম। এই যে তোমরা খাল পেরোতে পারছিলে না বলে আমাকে ধরে বসলে, আমাকে মাথা খাটাতে হল, বুদ্ধি বের করতে হল, এর দাম কি চার আনা আট আনা? মহাদেব দাসকে কি খেয়ার মাঝি পেয়েছ নাকি? এ-তল্লাটে সবাই আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে জানে, বুঝলে! টাকাটা ছাড়ো।"

বিদেশ-বিভূঁই বলে কথা, তার ওপর লোকটাও বদমেজাজি দেখে আর কথা না বাড়িয়ে ফটিক পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল।

মহাদেব দাস টাকাটা জামার পকেটে রেখে একটু নরম গলায় বলল, "না গেলে না যাবে, তবু বলছি তায়েবগঞ্জের হাটটাও কিন্তু কিছু খারাপ জায়গা ছিল

না। নয়ন ময়রার জিবেগজা পছন্দ না হলে সাতকড়ির বেগুনি তো রয়েছে। খাঁটি সর্ষের তেলে ভাজা, ওপরে পোস্ত ছড়ানো, চটিজুতোর সাইজ। তা বলে বেশি খেলে চলবে না, পেটে জায়গা রেখে খেতে হবে। ধরো, দশখানা করে খেয়ে তারপর গিয়ে বসলে রায়মশাইয়ের মণ্ডার দোকানে। ইয়া বড় বড় মণ্ডা। বেগুনির পরই মণ্ড খেতে যেন অমৃত। তাও যেতে ইচ্ছে করছে না?"

ফটিক কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। সন্ধের মধ্যে এক জায়গায় পৌছতেই হবে।"

মহাদেব একটু হতাশ হয়ে বলল, "তা যাবে কোথা? কুলতলি নাকি? সেও ভাল জায়গা। আজ সেখানে বোষ্টমদের মালসাভোগ আর দধিকর্দম হচ্ছে। এই তো সোজা নাক বরাবর হেঁটে গেলে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। তা কুলতলিতে কি তোমাদের মামাবাড়ি?"

ফটিক মাথা নেড়ে বলে, "কুলতলি নয়, আমরা যাব দোগেছে।"

মহাদেব দাস খানিকক্ষণ হাঁ করে অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলল, "কী বললে?"

মহাদেব ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "নাঃ, আমার কান দুটোই গেছে। বুঁচির মাও সেদিন বলছিল বটে, ওগো বুঁচির বাপ, তুমি কিন্তু আজকাল কান শুনতে ধান শুনছ। একবার কান দুটো শশধর ডাক্তারকে না দেখালেই চলছে না।"

নিতাই আর ফটিক মুখ-তাকাতাকি করল। দোগেছের নামটা অবধি অনেকের সহ্য হচ্ছে না দেখে তাদের একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

এবার নিতাই এগিয়ে এসে বলল, "আচ্ছা মহাদেবদাদা, দোগেছের নাম শুনলেই সবাই চমকাচ্ছে কেন বলতে পারেন?"

মহাদেব দাস একটু দম ধরে থেকে বিরস মুখে বলল, "চমকানোর আর দোষ কী বলো খোকারা! দোগেছে যাওয়া আর প্রাণটা যমের কাছে বন্ধক রাখা একই জিনিস। না হে বাপু, আমি বরং এইবেলা রওনা হয়ে পড়ি।"

নিতাই তাড়াতাড়ি পথ আটকে বলল, "না মহাদেবদাদা, তা হচ্ছে না। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলতে হবে।"

মহাদেব দাস বটতলার খালের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। তারপর বলল, "উরেব্বাস! সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা হে। না গেলেই নয়?"

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, "না গিয়ে উপায় নেই। আমার এক পিসি সেখানে থাকে। জন্মে তাকে দেখিনি কখনও। সেই পিসি চিঠি লিখে যেতে বলেছে। খুব নাকি দরকার।"

চোখ বড় বড় করে মহাদেব বলল, "পিসি! দোগেছেতে কারও পিসি থাকে বলে শুনিনি। তা পিসেমশাইয়ের নামটি কী?"

"শ্রীনটবর রায়।"

নামটা শুনেই মহাদেবের চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে সে বলল, "না, না, আমি কিছুই বলতে চাই না।"

ফটিক উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, তিনি কি খারাপ লোক?"

মহাদেব একটু খাপ্পা হয়ে বলল, "তাই বললুম বুঝি! নটবর রায়ের নাম তো জীবনে এই প্রথম শুনলাম রে!"

ফটিক আর নিতাই একটু চোখ-তাকাতাকি করে নিল। মহাদেব কিছু চেপে যাচ্ছে।

নিতাই নিরীহ গলায় বলল, "দেখ মহাদেবদাদা, আমরা ভিন গাঁয়ের লোক, এদিকে কখনও আসিনি। দোগেছে কেমন জায়গা একটু খোলসা করে বললে আমাদের সুবিধে হয়।"

মহাদেব উদাস গলায় বলল, "জায়গা খারাপ হবে কেন? পিসির বাড়ি বলে কথা। গেলেই হয়। তবে মাইলটাক গিয়ে হরিপুরের জঙ্গল পড়বে পথে। ওইটে পেরোতে পারলে গনা ডাইনির জলা। তারপর কাপালিকের অষ্টভুজা মন্দির। সেখানে এখনও নরবলি হয়। মন্দিরের পর মস্ত বাঁশবন। বাঁশবনের পর করালেশ্বরীর খাল। খাল পেরিয়ে দোগেছে। বাঁ দিকে নাক বরাবর রওনা হয়ে পড়ো। সাঁঝ বরাবর পৌছে যাবি, যদি না—"

বলে মহাদেব থেমে গেল।

ফটিক ঝুঁকে পড়ে বলল, "যদি না—কী গো মহাদেবদাদা?"

মহাদেব মাথাটাথা চুলকে বলল, "আমার মুশকিল কী জানিস? পেটে কথা থাকে না। কথা চাপতে গেলে পেটে এমন বায়ু হয় যে, তখন সামনে এক হাঁড়ি রসগোল্লা রাখলেও সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না।"

নিতাই বলল, "বায়ু হওয়া মোটেই ভাল নয়। কথা চেপে রাখার দরকারটাই বা কী?"

"তা না হয় বলছি। আগে দুটো টাকা দে। কথারও তো একটা দাম আছে!"

নিতাই অবাক হয়ে বলে, "এই যে পাঁচটা টাকা নিলে!"

"সে তো মগজের দাম। কথার দাম আলাদা। ডাক্তারের যেমন ভিজিট, উকিলের যেমন ফি, তেমনই মহাদেব দাস বুদ্ধিজীবীর কথারও একটু দাম আছে রে।"

গেল আরও দুটো টাকা। মহাদেব টাকাটা পকেটে চালান করে বলল, "হরিপুরের জঙ্গলে গাছে গাছে মেলা হনুমান দেখতে পাবি। তা বলে হনুমান নয় কিন্তু। ও হচ্ছে কালু ডাকাতের আস্তানা। তার শাগরেদরা গাছে ঝুলে ওত পেতে থাকে। যেই জঙ্গলে সেধোবি অমনই ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে ঘিরে ফেলবে। হাতে দা, টাঙ্গি, বল্লম।"

"ওরে বাবা!"

"সর্বস্ব খুইয়ে জঙ্গল যেই পেরোবি অমনই গনা ডাইনি খোনা গলায় ডাক দেবে, "কেঁ যাঁয় রেঁ? আয় বাবা, ফলার খেয়ে যা।"

“বটে!”

“যদি বাঁদিকে তাকাস তা হলেই হয়ে গেল। জলার মধ্যে টেনে নিয়ে পাঁকে পুঁতে মেরে ফেলবে। নয়তো গোরু ভেড়া বানিয়ে রেখে দেবে। চোখ কান বুজে মাঝখানের সরু পথটা পেরিয়ে গিয়ে পড়বি হারু কাপালিকের অষ্টভুজা মন্দিরের চত্বরে। নধরকান্তি ছেলেপুলে দেখলেই হারুর চেলারা ঝপাঝপ ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে পাতালঘরে ফেলে রাখবে। অমাবস্যার রাতে খুব ধুমধাম করে মায়ের সামনে বলি হয়ে যাবি।”

ফটিক বলল, “তা হলে কি ফিরে যাব?”

মহাদেব মোলায়েম গলায় বলে, “আহা, ফিরে যাওয়ার কথা উঠছে কেন? এসব বিপদ আপদ পেরিয়েও তো কেউ কেউ দোগেছে যায়, না কি? তা মন্দির পেরিয়ে বাঁশবন। সে নিশ্ছিদ্র বাঁশবন, দিনে দুপুরেও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ওই বাঁশবনে বহুকাল যাবৎ দুটি কবন্ধ বাস করে আসছে। উটকো মানুষ ঢুকলে ভারী খুশি হয়। তারা লোক খারাপ নয়, তবে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ হাডু-ডু খেলতে হবে। তা তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলে থাকছে শুধু করালেশ্বরীর খাল। তা সে খাল পেরোনো শক্ত হবে। রাসপুরের খালে কুমির না থাকলেও করালেশ্বরীর খালে তারা গিজগিজ করছে। তাদের পেটে রাবণের খিদে। হাঁ করেই আছে। আর সে এমন বড় হাঁ যে, জাহাজ অবধি সেঁধিয়ে যায়।”

ফটিক উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, “তা হলে পেরোব কী করে?”

“তা করালেশ্বরীর খালও পেরোনো যায়। কেউ কেউ তো পেরোয় রে বাপু মানছি, সবাই পেরোতে পারে না, দু-দশজন কুমিরের পেটেও যায়। তা বলে তোরা পারবি না কেন?”

ফটিক বলে, “খেয়া নেই?”

“সেও ছিল একসময়ে। মোট সাতজন মাঝি নৌকোসমেত কুমিরের পেটে যাওয়ায় ও পাট উঠে গেছে। দোগেছের লোকেরা খালের দু’ধারে দুটো উঁচু গাছে আড়া করে দড়ি বেঁধে দিয়েছে। গাছে উঠে ওই দড়িতে ঝুল খেয়ে খেয়ে পেরোতে হয়। কেঁদো কয়েকটা হনুমান ওই সময়ে এসে যদি কাতুকুতু না দেয় বা মাথায় চাঁটি না মারে, আর নীচে উপোসী কুমিরের হাঁ দেখে ভয়ে যদি তোদের হাত পা হিম হয়ে না যায় তা হলে দিব্যি পেরিয়ে যাবি। পেরিয়ে গিয়ে অবশ্য—”

ফটিক সভয়ে জিজ্ঞেস করল, “অবশ্য?”

মহাদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “বলে আর কী হবে? দোগেছে পৌঁছে তো তোরা নটবর রায়ের খপ্পরেই পড়ে যাচ্ছিস। তারপর যে কী হবে কে জানে!”

ফটিক শুকনো মুখে নিতাইয়ের দিকে ফিরে বলল, “কী করব রে নিতাই? এ যা শুনছি তাতে তো ফিরে যাওয়াই ভাল মনে হচ্ছে।”

মহাদেব বলল, “এসেই যখন পড়েছিস পিসির বাড়ি যাবি চলে তখন না হয় —”

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, "না মহাদেবদাদা, দোগেছে গিয়ে আর কাজ নেই। আমরা বরং বেলাবেলি ফেরতপথে রওনা হয়ে পড়ি।"

মহাদেব উদাস গলায় বলল, "তা যাবি তো ফিরেই যা, পৈতৃক প্রাণটা তা হলে এ যাত্রায় বেঁচে গেল। চ, তোদের খালটা পার করে দিই।"

নিতাই এবার বলে উঠল, "আমাদের কাছে কিন্তু আর পয়সা নেই।"

মহাদেব হেসে বলল,"পরের জন্য করি বলে আমার আর এ জন্মে পয়সা হল না রে। ঠিক আছে বাপু, বিনিমগনাই পার করে দিচ্ছি, দুধের ছেলেরা ভালয় ভালয় ফিরে গেলেই হল। দেখি, চিঠিখানা দেখি!"

ফটিক অবাক হয়ে বলল, "কীসের চিঠি?"

মহাদেব বলল, "কেন, এই যে বললি পিসি তোকে চিঠি দিয়ে আসতে বলেছে!"

ফটিক পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা বের করে দিতেই ভ্রু কুঁচকে মহাদেব বলল, "এ তো জাল জিনিস মনে হচ্ছে। কেউ তোদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। চিঠিটা আমার কাছে থাক, ব্যাপারটা বুঝে দেখতে হবে।"

এই বলে মহাদেব চিঠিটা পকেটে পুরে ফেলল।

মহাদেব দাসের নৌকোয় উঠে দু'জনে ফের খালের এপারে চলে এল। ফটিক তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে বলল, "পা চালিয়ে চল নিতাই।"

নিতাই ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটু আড়াল হয়েই বলল, "দাঁড়া।"

"কী হল?"

নিতাই আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল, মহাদেব দাস এদিকে একটু চেয়ে থেকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বেশ খুশি-খুশি মুখ করে পিছু ফিরে ডান দিকের রাস্তা ধরে হনহন করে হাওয়া হয়ে গেল।

নিতাই ফটিকের গাত ধরে টেনে বলল,"আয়, আমরা দোগেছে যাব।"

"বলিস কী? শুনলি না কী সাঙঘাতিক জায়গা!"

"তোর মাথা। লোকটাকে আমার একটুও বিশ্বাস হয়নি। আয় তো, একটা উটকো লোকের কথা শুনে এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে? এতই যদি খারাপ জায়গা তা হলে তোর পিসি কি তোকে সেখানে ডেকে পাঠাত?"

ফটিক ভিতু মানুষ। তবু নিতাইয়ের কথাটা একটু ভেবে দেখে বলল, "তা অবশ্য ঠিক, তবে—"

"তবে টবে নয়। আয় তো, যা হওয়ার হবে।"

দু'জনে ফের মহাদেবের নৌকোয় উঠে খাল পেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

ফটিক বলল, "মহাদেব লোকটা কোথায় গেল বল তো!"

নিতাই বলল, "শুনলি না তায়েবগঞ্জের হাটের কথা। এখন গিয়ে আমাদের পয়সায় সেখানে ভালমন্দ খাবে।"

সাত-সাতটা টাকার দুঃখে ফটিকের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে বলল, “পিসির চিঠিটাও তো লোকটা নিয়ে গেল।”

নিতাই বলল, “তুই দিতে গেলি কেন?”

ফটিক মুখ চুন করে বলল, “লোকটা যে বলল জাল চিঠি! কেউ আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে!”

‘ওকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হয়নি।”

“যাকগে, চিঠি তো আর তেমন কিছু নয়। আমিই তো যাচ্ছি।”

দুই

হরিপুরের জঙ্গলে পৌছতে বেশি সময় লাগল না। বিকেলের শুরুতেই পৌছে গেল তারা।

ফটিক একটু ইতস্তত করে বলল, "ঢুকব রে নিতাই?"

"না ঢুকলে জঙ্গল পেরোবি কী করে? আয় তো।"

জঙ্গল খুব একটা ঘন নয়। ভেতরে দিব্যি একটা শুড়িপথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দু'জনে ঢুকে পড়ল।

নির্বিঘ্নেই হাঁটছিল তারা। বনটা যেখানে একটু ঘন হয়ে এল সেখানে একটা মস্ত গাছ। গাছের তলায় পা দিতেই হঠাৎ সামনে ঝুপ করে কে একটা লাফিয়ে নামল। দুজনে চমকে উঠে ভয় খেয়ে থমকে দাঁড়াল। লাফ-দেওয়া লোকটার পরনে খাটো মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে একটা বেনিয়ান, মুখটা লাল একটা গামছায় ঢাকা, হাতে একখানা ছোরা। লোকটা উবু হয়ে বসে তাদের দিকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু কঁকিয়ে উঠে বলল, "উঃ, মাজাটা গেছে বাপ। এই বয়সে কি আর লাফঝাঁপ সয়। বলি হাঁ করে দেখছিস কী আহাম্মকেরা? ধরে একটু তুলবি তো।"

নিতাই আর ফটিক চোখাচোখি করে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে লোকটাকে দাঁড় করাল। লোকটা নিতান্তই ছোটখাটো, বয়সও সত্তরের ওপর। নিতাই বলল, "এই জঙ্গলের মধ্যে ছোরা নিয়ে কী করছিলেন?"

লোকটা মুখ বিকৃত করে বলল, "গুষ্টির পিণ্ডি চটকাচ্ছিলাম রে বাপ। নে, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, সঙ্গে যা আছে সব দিয়ে এখন মানে মানে কেটে পড়।"

নিতাই অবাক হয়ে বলল, "তার মানে! আপনি কি ডাকাত নাকি?"

মুখের গামছাট সরিয়ে লোকটা খিচিয়ে উঠল, "ডাকাত না তো কী? সঙ নাকি?"

নিতাই হেসে ফেলে বলল, "আমাদের কাছে কিছু নেই। আমরা দু'জনেই গরিব মানুষ।"

লোকটা ভারী হতাশ হয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলল, "সবাই যদি ওই কথা বলে তা হলে আমার চলে কীসে বলতে পারিস? যাকেই ধরি সেই বলে, কিছু নেই, আমরা গরিব। আবার কেউ বলে, পরে দিয়ে যাব। ওরে বাবা, চুরি-ডাকাতিতে কি আর ধারবাকি চলে? এ হল নগদা-নগদির কারবার।"

ফটিক হাঁ করে লোকটাকে দেখছিল। এবার সাহস করে বলল, "আপনিই কি কালু ডাকাত?"

রোগা লোকটা বুক চিতিয়ে বলল, "তবে?"

"তা আপনাকে তো একা দেখছি! আপনার শাগরেদরা সব কোথায়?"

"তাদের কথা আর বলিসনি। বুড়ো হয়ে কয়েকটা মরেছে, যারা আছে তাদের কতক ঘরগেরস্থালি চাষবাস নিয়ে আছে, কতক আবার বুড়ো বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে মেতে আছে। তাদের অধঃপতন দেখলে চোখের জল চাপতে পারবি না। আমি এখন একাই এই হরিপুরের জঙ্গল সামলাচ্ছি। তা যাকগে সেসব দুঃখের কথা। সঙ্গে একশো দুশো যা আছে দিয়ে ফেল তো, তারপর হালকা হয়ে যেখানে যাচ্ছিস চলে যা। গায়ে আঁচড়টিও পড়বে না।"

নিতাই জিভ কেটে বলল, "ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন কালু ওস্তাদ!

আপনার মতো মান্যগণ্য ডাকাতের কি আমাদের মতো এলেবেলে লোকের ওপর চড়াও হওয়া শোভা পায়! আমাদের বেঁচলেও একশো দুশো টাকা হবে না।"

"তবে তো মুশকিলে ফেললি। আজ এখন অবধি বউনিটাই হয়নি যে! বিশ পঞ্চাশটা টাকা হয় কিনা বাক্সপ্যাটরা হাতড়ে একটু দেখ দিকি বাপু।"

ফটিক মুখখানা মলিন করে বলে, "বিশ পঞ্চাশ! সে যে অনেক টাকা দাদু!"

কালু করুণ মুখ করে বলল, "আজ মনসাপোতায় হাটবার। গিন্নি একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছে। তা সেসব আর হবে না দেখছি। তা না হোক, অন্তত বউনিটা করিয়ে দে তো বাপ। পাঁচ দশ যা হোক দে দিকি। এই হাত বাড়িয়ে মুখটা ফিরিয়ে রাখছি। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধই হচ্ছে বটে, কিন্তু বউনিটা যে না হলেই নয়।"

নিতাই ট্যাক থেকে একখানা সিকি বের করে কালু ডাকাতের হাতে দিতেই হাতটা মুঠো করে কালু বলল, "কী দিলি? কিছু তো টেরই পাচ্ছি না।"

নিতাই ভারী লাজুক গলায় বলল, "ও আর দেখবার দরকার নেই। পকেটে পুরে ফেলুন।"

"কিছু দিয়েছিস তো সত্যিই?"

"দিয়েছি।"

কালু চোখ না খুলেই বলল, "বড্ড ছোট জিনিস দিয়েছিস রে। এ কি সিকি নাকি?"

নিতাই বলল, "আর লজ্জা দেবেন না। সিকি ছোট জিনিস বটে, কিন্তু আমাদের কাছে সিকিও অনেক পয়সা। আপনার বউনি হয়নি বলেই দেওয়া।"

কালু সিকিটা পকেটে পুরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেশে এত গরিব কোত্থেকে আসছে বল তো! গরিবে গরিবে যে গাঁ-গঞ্জ ভরে গেল ! এ তো মোটেই ভাল লক্ষণ নয়।"

ফটিক বলল, "আজ্ঞে, দেশের খুবই দুরবস্থা। এবার আমাদের ছেড়ে দিন, অনেকদূরে যাব।"

কালু ডাকাত ফের গাছে উঠতে উঠতে বলল, "যাবি তো যা। তবে লোককে সিকির কথাটা বলিস না। তা হলে ওটাই রেট ধরে নেবে সবাই।"

নিতাই বলে, "আজ্ঞে না। ওসব গুহ্য কথা কি কেউ ফাঁস করে ?"

কালু ডাকাতের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে দু'জনে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

জঙ্গল পেরিয়েই একটা ফাঁকা জায়গা। বাঁ ধারে নাবাল জমি, ডানে ধানখেত। মাঝখান দিয়ে রাস্তা।

ফটিক একটু ভয়-খাওয়া গলায় বলল, "এটাই কি গনা ডাইনির জলা নাকি রে নিতাই?"

নিতাই জবাব দেওয়ার আগেই বাঁ ধার থেকে খোনা সুরে জবাবটা এল, "হ্যাঁ গো ভালমানুষের পো, এটাই গনা ডাইনির জলা। তা তোমরা দুটিতে চললে কোথায়? আহা রে, মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে! আয় বাছারা, বসে দুটি ফলার খেয়ে যা।"

ফটিক চমকে উঠে বলল, "বাপ রে! বাঁধারে তাকাস না নিতাই, দৌড়ো!"

নিতাই কিছু সাহসী। সে বলল, "দাঁড়া না, রগড়টা দেখেই যাই।"

ফটিক দৌড়ে পালাল বটে, কিন্তু নিতাই পালাল না। সে বাঁধারে চেয়ে দেখল, একখানা খোড়ো ঘরের সামনে একজন খুনখুনে বুড়ি লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চালে দিব্যি লাউডগা উঠেছে, ফলন্ত গাছগাছালি, কলার ঝাড়ও দেখা যাচ্ছে।

নিতাই হেঁকে বলল, "তা কী খাওয়াবে গো ঠাকুমা? আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।"

বুড়ি বা হাত তুলে লম্বা লম্বা আঙুলে হাতছানি দিয়ে বলল, "আয় বাছা আয়! কত খাবি খেয়ে যা।"

নিতাইয়ের বুকটা একটু দুরুদুরু করল বটে, তবে সে এগিয়েও গেল। এত খিদে পেয়েছে যে, ফলারের লোভ সামলানো মুশকিল। সামনে দিব্যি নিকোনো উঠোন। উঠোনের মাঝখানে একখানা কদম গাছ চারদিকে গোরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিতাই বলল, "তা আপনিই কি গনা ডাইনি ঠাকুমা ?"

"তাই তো সবাই বলে রে বাপ, ভয়ে কেউ ধারেকাছে আসে না।"

"তা লোকে ভয়ই বা পায় কেন?"

গনা ডাইনি দুঃখ করে বলল, "খামোখা ভয় পায় বাপ, খামোখা ভয় পায়। চেয়ে দেখ দিকি, কাউকে কি আমি খারাপ রেখেছি! ওই যে দেখছিস ধাড়ি ছাগলটা, ও হল নবগ্রামের পটু নস্কর। এক নম্বরের সুদখোর, ছ্যাঁচড়া, পাজি লোক। দেখ তো এখন কেমন দিব্যি আছে। ঘাসপাতা খায়, চরায় বরায় ঘুরে বেড়ায়। আর ওই যে গোরুটা দেখছিস, ছাই-ছাই রঙ, ও হল গোবিন্দপুরের অতসী মণ্ডল। এমন ঝগড়ুটে ছিল যে, পাড়ায় লোক তিষ্ঠোতে পারত না। ওর স্বামীটা সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছে। এখন দ্যাখ তো, অতসী কেমন ধীরস্থির ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সাত চড়ে রা কাড়বে না। আর ওই কেলে কুকুরটা কে বল তো! ও হল চরণগঙ্গার হরিপদ দাস। সবাই বলত, খুনে হরিপদ। কত খুনখারাপি যে করেছে তার হিসেব নেই। এখন দ্যাখ, কেমন মিলেমিশে আছে সবার সঙ্গে। কারও খারাপ কিছু করেছি কি, তুই-ই বল। আর ওই জলায় যাদের পুঁতে রেখেছি

তাদেরও তো প্রাণে মারিনি রে বাপু ওই দ্যাখ, গদাই নস্কর কেমন চুরি করা ছেড়ে বকুল গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। ওই যে শিমুলগাছটা দেখছিস ও হল হাড়কেপ্পন গণেশ হাওলাদার। আর ওই যে দেখছিস...”

নিতাইয়ের মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, ধপ করে কদমগাছটার তলায় বসে পড়ে চোখ বুজে ফেলল। অতি-সাহস দেখাতে গিয়ে বড় ভুল করে ফেলেছে তা বুঝতে পারছে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু এখন হাত পা এমন অবশ যে, পালানোর শক্তিও নেই।

গনা ডাইনি খলখল করে হেসে বলল, “মুচ্ছে গেলি নাকি বাপ? তা ভয়টা কীসের? তোর জন্য আমি খুব ভাল ব্যবস্থা করছি। মন্তর পড়ে এই ধুলোপড়া যে-ই গাঁয়ে ছুড়ে মারব সেই তুই একটা চনমনে টগবগে সাদা ঘোড়া হয়ে যাবি। ঘোড়া হওয়া কি খারাপ বল! সাদা ঘোড়ার দেমাকই আলাদা।”

নিতাই আধবোজা চোখে চেয়ে দেখল, গনা ডাইনি উঠোন থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। নিতাই অবশ শরীরে বসে ঘোড়া হওয়ার বিবিধ অসুবিধের কথা ভেবে নিচ্ছিল। প্রথম অসুবিধে, ঘোড়া হলে তার চারটে পা গজাবে বটে কিন্তু হাত দুটো গায়েব হয়ে যাবে। হাত না থাকলে লেখাপড়া করা যাবে না, একটু ছবি আঁকার শখ ছিল তার, তা সেটারও বারোটা বাজল, কালী নদীর কাছে তবলার মহড়া নিচ্ছিল, তারও হয়ে গেল। উপরন্তু হাত দিয়ে মেখে ভাতের গরাস মুখে তোলাও ভুলতে হবে। ঘাসপাতা খেতে কেমন লাগে সে জানে না। ওসব তার সইবে কি? পোস্ত চচ্চড়ি, পোড়ের ভাজা, মুগের ডাল বা মাছের ঝোলের কথাও ভুলতে হবে। অসুবিধে আরও আছে। সে শুনেছে ঘোড়ারা দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। সে কস্মিনকালে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়নি, এখন পেরে উঠবে কী?”

গনা ডাইনি মন্ত্র পড়া শেষ করে মুঠোভর ধুলো তার গায়ে ছুড়ে মেরে একগাল হেসে বলল, “নে বাপ, এবার ঘোড়া হয়ে আনন্দে থাক। কোনও ঝায় ঝামেলা আর রইল না।”

নিতাই চি হি হি বলে একটা ডাক ছেড়ে গা-সাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। ঘোড়া হয়ে তার অন্যরকম কিছু লাগছে না তো! নিজেকে এখনও নিতাই-নিতাই বলেই মনে হচ্ছে যে!

গনা ডাইনি গোল গোল চোখ করে তাকে দেখছিল। এবার ভারী হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল, “নাঃ, মন্তরে কাজ হচ্ছে না তো! আর হবেই বা কী করে? পাঁচ কুড়ি সাত বচ্ছর বয়স হল বাপ, মাথাটার কি কিছু আছে! সব কেমন ভুল হয়ে যায়। অর্ধেক মন্তর বলার পর কেমন যেন ঢুলুনি এসে পড়ে, তারপর আর বাকি মন্তরটা মনেই পড়ে না। মাথাটা বেভুল হয়ে পড়েছে বড়।”

নিতাই গা-ঝাড়া দিয়ে বসল। তার ভয়ডর কেটে গেছে। সে বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠল, “তা বললে হবে কেন ঠাকুমা? আমার যে অনেকদিন ধরে ঘোড়া হওয়ার বড় শখ! আপনি ঘোড়া বানিয়ে দেবেন বলে কত আশা করে বসে ছিলাম। কিন্তু

এ তো দেখছি জোচ্চুরি! অ্যা! এ যে দিনে ডাকাতি! এ যে সাঙ্ঘাতিক লোকঠকানো কারবার!"

গনা ডাইনি আকুল হয়ে বলল, "ওরে চুপ! চুপ! লোকে শুনতে পেলে যে গনা ডাইনির বাজার নষ্ট হবে! চুপ কর ভাই, যা চাস দেব।"

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "না না, আমি কিছু চাই না, আমি শুধু ঘোড়া হতে চাই। ঘোড়া হব বলে সেই কতদূর থেকে আসা। এত নামডাক শুনেছিলুম আপনার, এখন তো দেখছি পুরোটাই ফাঁকিবাজি।"

"চেঁচাসনি বাপ, চেঁচাসনি। লোকে শুনলে দুয়ো দেবে যে আমাকে! তা কী খাবি বাপ, বল তো! ভাল চিড়ে, মুড়কি, ঝোলা গুড়, পাকা কাঁঠাল আর তালের বড়া হলে হবে? সঙ্গে বিচেকলাও দেব'খন।"

নিতাই একটু নরম হয়ে বলল, "এ তো নাকের বদলে নরুন হল গো ঠাকুমা! তা কী আর করা যাবে, তাই আনুন দেখি।"

ওদিকে ফটিক পালালেও বেশিদূর যায়নি। নিতাই আসছে না দেখে সেও গুটিগুটি ফিরে এল। তারপর আড়াল থেকে উকি মেরে দেখল, নিতাই কদমগাছের তলায় পিঁড়িতে বসে বিরাট ফলার সাটাচ্ছে খিদে ফটিকেরও পেয়েছে। সুতরাং ভয়ডর ঝেড়ে ফেলে সেও গিয়ে নিতাইয়ের পাশে বসে পড়ল।

গনা ডাইনি ঘর থেকে বিচেকলা নিয়ে বেরিয়ে এসে ফটিককে দেখে বলল, "ওমা! এ আবার কে রে?"

নিতাই একটু হেসে বলল, "আমিও একটু-আধটু মন্তর জানি গো ঠাকুমা। তোমার ধাড়ি ছাগলটাকে মন্তর দিয়ে পটু নস্কর বানিয়ে দিয়েছি ফের। দাও, ওকেও ফলার দাও। আহা বেচারা কতকাল ঘাসপাতা খেয়ে আছে।"

গনা ডাইনি উচ্চবাচ্য না করে ফটিককেও দিল। খুব খেল দুজনে। খেয়ে খেয়ে টান হয়ে গেল। তারপর জল খেয়ে উঠে পড়ল, "চলি গো ঠাকুমা।"

গনা ডাইনি বলল,"আয় বাছা, আজকের বৃত্তান্তটা যেন পাঁচকান করিসনি।"

"পাগল ! এসব গুহ্য কথা কি কাউকে বলতে হয়?"

রাস্তায় এসে হাঁটতে হাঁটতে ফটিক বলল,"তোর কি দুর্জয় সাহস? ডাইনির ডেরায় কোন সাহসে ঢুকলি, যদি পাঁকে পুতে ফেলত বা গোরু ভেড়া করে দিত?"

"ধুস! গোরু ভেড়া হতে যাব কেন? আমি একটা সাদা ঘোড়া হয়ে যাচ্ছিলাম। সেসব কথা পরে হবে। ওই দ্যাখ, অষ্টভুজার মন্দির।"

ফটিক বলল, "ওখানে আর দাঁড়ানোর দরকার নেই। চল দৌড়ে পেরিয়ে যাই।"

নিতাইয়ের এখন সাহস খুব বেড়ে গেছে। বলল, "পালাব কেন? সব দেখেশুনে নেওয়া ভাল, অভিজ্ঞতায় জ্ঞান বাড়ে।"

অষ্টভুজার মন্দির হেসেখেলে এক-দেড়শো বছরের পুরনো হবে। চারদিকে মস্ত মস্ত বটগাছ। বটের ঝুরি নেমে জায়গাটা এই বিকেলবেলাতেও অন্ধকার করে রেখেছে। মন্দিরের চত্বরে ঢুকতেই তারা শুনতে পেল একটা গুরুগম্ভীর গলা

মন্দিরের ভেতর থেকে বলছে, "মা! মা! নররক্ত চাই মা করালবদনী? নরবলি চাস মা? আজ অমাবস্যার রাতেই নরবলি দেব মা!"

ফটিকের মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, "শুনছিস?"

নিতাই বলল, "শুনছি, কিন্তু ভয় খাস নে। লোকটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।"

এই বলে নিতাই হঠাৎ বিকট একটা হাঁক মারল, "ঠাকুরমশাই আছেন নাকি? ঠাকুরমশাই!"

ভেতরে গুরুগম্ভীর গলাটা হঠাৎ থেমে গেল। একটু বাদে যে লোকটা মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তাকে দেখে ফটিকের মুর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ঘাড়ে গর্দানে বিশাল চেহারা, পরনে টকটকে লাল রক্তাম্বর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে তেল সিঁদুরের ত্রিশূল আঁকা, চোখ দুখানা ভাঁটার মতো জ্বলছে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা? কী চাও?'

নিতাই বেশ গলা তুলে বলে উঠল, "পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই! তা অনেকদূর থেকে আসছি। শুনলুম এই অষ্টভুজার মন্দিরে নিয়মিত নরবলি হয়। সেই শুনেই আসা।"

লোকটা বলল "অত চেঁচামেচি করার দরকার নেই। ওতে মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়।"

নিতাই গলা একটুও না নামিয়ে ফের চেঁচিয়ে বলল, "বড় আশা করে এসেছি যে ঠাকুরমশাই। এসেই শুনতে পেলুম আপনি আজ রাতেই মায়ের সামনে নরবলি দেবেন। আমাদের ভাগ্যটা ভালই, কী বলেন?"

লোকটা অস্বস্তি বোধ করে চারদিকে চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "তোমরা ভুল শুনেছ।"

নিতাই দুঃখের গলায় বলল, "এঃহেঃ, এতবড় একটা ভুল খবর পেয়ে এতদূর এলাম। নরবলি দেখার যে খুব সাধ ছিল মশাই!"

লোকটার চোখ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল, বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল, "দেখতে চাও?'

নিতাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ কোথা থেকে দুটো মুশকো লোক এসে দুদিক থেকে ধরে তাকে পেড়ে ফেলল। তারপর চোখের পলকে হাত দুটো পিছমোড়া করে আর পা দুটোও বেঁধে তাকে হাড়িকাঠে উপুড় করে ফেলে গলার কাছে খিলটা আটকে দিল।

জবরদস্ত লোকটা চেঁচাচ্ছিল, "ওরে তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি কর! সতীশ দারোগা এসে পড়বে।"

দুটো মুশকো লোক, একজন দৌড়ে গিয়ে একটা ঢাক নিয়ে এসে ট্যাং ট্যাং করে বাজাতে লাগল, অন্যজন একখানা চকচকে খাঁড়া এনে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে "জয় মা, জয় মা অষ্টভুজা! জয় মা নৃমুণ্ড-মালিনী" বলে নিতাইয়ের চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল।

ঠাকুরমশাই উচ্চস্বরে বলির মন্ত্র পড়ছেন আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, “নররক্ত চাই মা? নরবলি চাই মা? তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।”

মন্ত্র পড়া শেষ করে ঠাকুরমশাই বলে উঠলেন, “তাড়াতাড়ি কেটে ফেল বাবা, সতীশ দারোগা কখন হানা দেয় তার ঠিক নেই।”

যে ঢাক বাজাচ্ছিল সে দৌড়ে গিয়ে একটা মাটির সরা এনে নিতাইয়ের মুখের নীচে পেতে দিল, বোধ হয় এতে করেই কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে গিয়ে অষ্টভুজাকে ভোগ দেবে।

দ্রিমি দ্রিমি করে ঢাক বাজতে লাগল। নিতাইয়ের মনে পড়ল, বলির সময়ে এরকম বাজনাই বাজে বটে। ভয়ে সে চোখ বুজে ফেলল। নাঃ, অষ্টভুজার মন্দিরের কাপালিককে চটানোটা বড্ড আহাম্মকিই হয়ে গেছে।

ঠাকুরমশাই জলদগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, “জয় মা! এবার ঘ্যাচাং করে দাও হে গদাইচাঁদ।”

“আজ্ঞে বাবা।” বলেই খাঁড়াটা ওপরে তুলল বলাই। খাঁড়াটা নেমেও এল বটে, তবে বেশ আস্তে। নিতাই ঘাড়ে একটু চিনচিনে ব্যথা টের পেল। তার গলা বেয়ে দুফোঁটা রক্তও পড়ল সরায়।

++++++++++++++++++++++++++++++++++

লোকটা খাঁড়াটা ফেলে হাড়িকাঠের খিল খুলে দিয়ে গাত পায়ের বাঁধন আলগা করে নিতাইকে দাঁড় করিয়ে একগাল হেসে বলল, “তোর বড় ভাগ্য, মায়ের কাছে বলি হলি, তোর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার পেয়ে গেল।”

ঠাকুরমশাই সরাটা তুলে নিয়ে ভক্তিগদগদ গলায় “জয় মা, এই যে নররক্ত এনেছি মা, নে মা ... নে মা ....” বলতে বলতে মন্দিরে ঢুকে গেল।

নিতাই ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, “বলি হয়ে গেলুম নাকি? কিন্তু ঘাড়টা তো আস্তই আছে।”

বলাই একটু হেসে বলল, “এর বেশি বলি দেওয়ার কি উপায় আছে রে? সতীশ দারোগা নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরবে যে। তারপর ফাঁসিতে ঝোলাবে। আসলে বলি হত ঠাকুরমশাইয়ের পিতামহের আমলে। এখন যা হয় তাকে কী একটা বলে যেন, পতিক না পরীক কী যেন।”

“প্রতীক নয় তো!”

++++++++++++++++++++++++=

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটেই। বলিও হল, ঘাড়ও আস্ত রইল, মাও নররক্ত পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন।”

ঢাকি লোকটা একটু তুলোয় করে আয়োডিন এনে তার ঘাড়ের কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে বলল, “এবার কেটে পড়ো তো বাপু, সতীশ দারোগা এসে পড়লে কিন্তু সবাইকে থানায় নিয়ে যাবে।”

হতবুদ্ধি নিতাই তাড়াতাড়ি রওনা হল। বাঁশবনের মধ্যে ফটিকের সঙ্গে দেখা। ভয়ে কাঁপছে।

"তুই যে বলি হলি? ভূত নোস তো।"
"তাও বলতে পারিস।"
"ওরে বাবা—"
হঠাৎ একটা বাঁশের ডগা মটমট করে দুলে উঠল, ওপর থেকে কে একজন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, "কে রে, কোন ভূত ঢুকেছিস আমাদের বাঁশবনে?"
দু'জনেই ভয়ে হিম হয়ে গেল। নিতাই কাঁপা গলায় কোনও রকমে বলল, "আমরা ভূতটুত নই, নিতান্তই মনিষ্যি।"
বাঁশের ডগাটা আবার নড়ল। হেঁড়েগলা বলল, "অ, তুই তো একটু আগে অষ্টভুজার মন্দিরে বলি হলি।"
"যে আজ্ঞে।"
"তা তোর কপালটা ভাল, আমাদের কপাল তত ভাল ছিল না। ওই হরু ঠাকুরের ঠাকুর্দা বীরু কাপালিকের হাতে আমরা সত্যিই বলি হয়েছিলাম। সেই থেকে কবন্ধ হয়ে এই বাঁশবনে থানা গেড়েছি।"
নিতাই সভয়ে জিজ্ঞেস করল, "হা-ডু-ডু খেলতে হবে নাকি? শুনেছি, আপনারা মানুষ পেলে হা-ডু-ডু খেলেন।"
"সে খেলতুম রে। মনসাপোতার জয়নাথ পণ্ডিত আমাদের একটা দাবা আর খুঁটি কিনে দিয়েছে। খেলাটাও শিখে নিয়েছি। আহা, দাবার মতো খেলা নেই। হা-ডু-ডু আবার একটা খেলা? যা, তোরা, আমার মন্ত্রী এখন ঘোড়ার মুখে পড়েছে।"
দুজনে হুড়মুড় করে বাঁশবনটা পেরিয়ে করালেশ্বরীর খালের ধারে এসে পড়ল। কিন্তু কোথায় খাল! শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে আছে। খালের ভেতর দিয়ে পায়েচলার রাস্তা। ফটিক হাঁফ ছেড়ে বলল, "যাক বাবা, দড়িতে ঝুলে পেরোতে তো হবে না।"
সন্ধে হয়ে আসছে। ওপারেই দোগেছে।
খালটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে তখন দেখা গেল একটা লোক উবু হয়ে বসে আছে। তার পায়ের কাছে অনেক গোদা গোদা টিকটিকি, লোকটা একটা খালুই থেকে চুনোমাছ বের করে টিকটিকিদের খাওয়াচ্ছে। আর তারাও মহানন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে।
দৃশ্যটা দেখে দাঁড়িয়ে গেল দু'জন।
ফটিক বলল,"লোকটার বড্ড দয়ার শরীর, টিকটিকেদের মাছ খাওয়াচ্ছে দ্যাখ।"
লোকটা মুখ তুলে বলল, "টিকটিকি নয় গো, টিকটিকি নয়।"
"তবে?"
"এরা সব হল করালেশ্বরীর বিখ্যাত কুমির। একসময়ে দশ বিশ হাত লম্বা ছিল। আস্ত আস্ত গোরু মোষ ছাগল কপাত কপাত করে গিলে ফেলত। তা করালেশ্বরীর খাল হেজেমজে গেল, আর কুমিরগুলোও না খেতে পেয়ে শুকিয়ে

শুকিয়ে সব একটুখানি হয়ে গেল। তাদের বাচ্চাগুলোও ছোট ছোট হতে লাগল। তস্য বাচ্চাগুলো আরও ছোট হতে লাগল। হতে হতে এই দশা।

"কুমির?" বলে ফটিক এক লাফে উঁচু ডাঙায় উঠে গেল। লোকটা বলল, "ভয় নেই গো, ওদের কি আর সেই দিন আছে? এখন চুনোমাছের চেয়ে বড় কিছু খেতেই পারে না। আর তা-ই বা ওদের দেয় কে বলো! এই আমারই একটু মায়া হয় বলে বিকেলের দিকে এসে খাইয়ে যাই।"

নিতাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে বলল,"মানে হচ্ছে এ হল কুমিরের বনসাই।"

সন্ধে হয়ে আসছে বলে দু'জনে আর দাঁড়াল না। করালেশ্বরীর মরা খাত পেরিয়ে দোগেছের মাটিতে পা দিয়েই তারা বুঝল, এ এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক পাকা বাড়ি, বাঁধানো রাস্তা আর দোকানপাট দেখা যাচ্ছে।

তিন

কয়েক পা এগোতেই একজন বেশ আহ্লাদি চেহারায় লোকের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ধুতি পাঞ্জাবি পরা, গোলগাল চেহারা আর হাসি-হাসি মুখের লোকটা তাদের দেখেই বলে উঠল, "এই যে, তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

ফটিক বলল, "আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে।"

"বাঃ বাঃ বেশ। তা নটবর রায়ের বাড়ি যাবে নাকি?"

ফটিক অবাক হয়ে বলল, "কী করে বুঝলেন?"

"সে আর শক্ত কী? তা তোমাদের মধ্যে কোনজন ফটিক ঘোষ বলো তো! না কি দু'জনেই ফটিক ঘোষ?"

ফটিক হাঁ। এ যে তার নামও জানে।

নিতাই তাড়াতাড়ি বলল, "এই হল ফটিক ঘোষ। আর আমি নিতাই।"

লোকটা আহ্লাদি গলায় বলল, "পায়রাডাঙার হরিহর ঘোষের ছেলে তো তুমি, তাই না?"

ফটিকের প্রথমটায় বাক্য সরল না, এত অবাক হয়েছে সে। তারপর বলল, "কী করে জানলেন?"

"আমি অন্তর্যামী যে! তা নটবর রায়ের বাড়ির পথ খুব সোজা। এই রাস্তা ধরে নাক বরাবর চলে যাও। চৌপথির পরেই দেখবে ডানধারে মস্ত দেউড়ি, বিরাট বাগান, আর খুব বড় দালানকোঠাওলা বাড়ি। ফটকে ভোজপুরি দরোয়ান আছে ও বাড়ি ভুল হওয়ার জো নেই।"

"লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে ডানধারের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার পর ফটিক নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, "কিছু বুঝতে পারলি নিতাই?"

"কী বুঝব?"

লোকটা আমাকে চিনল কী করে? আমার বাবার নাম, গাঁয়ের নাম অবধি জেনে বসে আছে!"

নিতাই বলল, "তুই যে আসবি সেটা বোধ হয় নটবর রায় সবাইকে বলে রেখেছে। তবে লোকটার একটা কথা একটু গণ্ডগোলের।"

"কোন কথাটা বল তো।"

"ওই যে বলল না, তোমাদের মধ্যে কোনজন ফটিক ঘোষ বলো তো! না কি দু'জনেই ফটিক ঘোষ। কথাটা হল, দুজন ফটিক ঘোষ হয় কী করে?"

"হ্যাঁ, সেটাও ভাববার কথা।"

"অত ভেবে লাভ নেই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আগে তোর পিসির কাছে চল তো!"

পাঁচ ছয় মিনিট পর চৌপথি পেরিয়ে যে বাড়িটার দেউড়ির সামনে তারা দাঁড়াল তাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদও বলা যায়। বিশাল দেউড়ি, ভেতরে মস্ত বাগান, বাগান পেরিয়ে বিরাট বড় দোতলা বাড়ি। বাড়ি দেখে দুজনেই হাঁ।

নিতাই বলল, "তোর পিসেমশাই যে এত বড়লোক তা আগে বলবি তো?"

ফটিক বলল, "দুর! পিসে বা পিসির কোনও খবরই তো আমরা জানতাম না। যোগাযোগই ছিল না। শুধু জানতাম আমার এক পিসি আছে, অনেক দূরে থাকে।"

দু'জনে একটু ভয়ে ভয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতেই বিশাল চেহারার ভোজপুরি দরোয়ানটাকে দেখতে পেল। মিলিটারির মতো পোশাক, বিশাল পাকানো গোঁফ, বড় জুলপি, মাথায় আবার পাগড়িও আছে।

তাদের দেখেই দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলল,"রাম রাম বাবুজি। ফটিক ঘোষ আছেন নাকি আপনারা?"

ফটিক বলল, "আমি ফটিক ঘোষ, আর এ হল আমার বন্ধু নিতাই।"

"পায়রাডাঙার হরিহর ঘোষের ছেলিয়া তো!"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

"জান পহচান তো কুছু নাই। লেকিন আপনাকে দেখে মনে হল কি আপ ফটিক ঘোষ ভি হোতে পারেন। তো সিধা চলিয়ে যান, এই বড়া কাছারি ঘরে বড়বাবু ফটিক ঘোষের জন্য বসিয়ে আছেন।"

ফটিক আর নিতাই পরস্পরের দিকে তাকাতাকি করে নিল। তারপর একটু ভ্যাবাচাকা মুখে গুটিগুটি ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। অনেকটা হেঁটে গিয়ে তবে কাছারিঘর।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে মস্ত মস্ত থামওলা বারান্দা পেরিয়ে তবে কাছারিঘর। তা ঘরখানাও হলঘরের মতো। ঝাড়লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরির আলোয় ঝলমল করছে। নিচু মস্ত এক তক্তপোশে সাদা ধপধপে বিছানায় যিনি বসে আছেন তাঁর চেহারাটা দেখবার মতো। যেমন লম্বাচওড়া তেমনই টকটকে ফরসা রং, গায়ে ফিনফিনে আদির পাঞ্জাবি আর তেমনই ফিনফিনে শৌখিন ধুতি। চেহারাটা এত শক্তপোক্ত যে, বয়স বোঝা যায় না। আর চোখ দুটো এত তীক্ষ্ণ যে, তাকালে ভয়-ভয় করে। মুখখানা খুবই গম্ভীর। ফটিক আর নিতাই পটাপট প্রণাম সেরে নিল।

তিনি তাদের দিকে গম্ভীর মুখে চেয়ে বললেন, "কে তোমরা?"

ফটিক আমতা আমতা করে বলল, "আপনিই কি নটবর রায়— মানে পিসেমশাই?"

"আমিই নটবর রায়, তবে পিসেমশাই কিনা তা জানি না। তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

ফটিক জড়োসড়ো হয়ে বলল, "পায়রাডাঙা থেকে। আমি হরিহর ঘোষের ছেলে ফটিক।"

এ-কথায় নটবর রায় বিশেষ খুশি হলেন বলে মনে হল না। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "সবাই তাই বলছে বটে। দেখি, চিঠিখানা দেখি।"

ফটিক তাড়াতাড়ি তার টিনের বাক্স খুলে একখানা চিঠি বের করে নটবর রায়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই যে চিঠি, আমার বাবা পিসিকে দিয়েছেন।"

নটবর রায় চিঠিখানা সরিয়ে রেখে বললেন, "এ-চিঠির কথা বলিনি। তোমার বাবার হাতের লেখা আমরা চিনি না, কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই। কাজেই এই চিঠি থেকে প্রমাণ হয় না যে তিনিই আসল হরিহর ঘোষ বা তুমিই তাঁর ছেলে ফটিক।"

"তা হলে কোন চিঠি ?"

"তোমার পিসি তোমার বাবাকে যে পোস্টকার্ডখানা পাঠিয়েছিল সেখানা কোথায়? সেই চিঠির নীচে পুনশ্চ দিয়ে লেখা ছিল, ফটিক যেন চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে আসে।"

আনছিলাম, তবে পথে খোয়া গেছে। একজন লোক চিঠিটা যাচাই করতে নিয়ে গেছে, আর ফেরত দেয়নি।"

নটবর রায় গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ বেশ। চমৎকার। তা শোনো হে ছোকরা, গত চারদিনে তোমাকে নিয়ে অন্তত ষোলোজন ফটিক ঘোষ এসে হাজির হয়েছে। তারা সবাই বলেছে প্রত্যেকেই নাকি পায়রাডাঙার হরিহর ঘোষের ছেলে ফটিক ঘোষ। কেউই অবশ্য পোস্টকার্ডখানা দেখাতে পারেনি। আমার যতদূর জানা আছে, আমার সম্বন্ধি হরিহর ঘোষের একটাই ছেলে, তার নাম ফটিক। কিন্তু যদি হরিহর ঘোষের ষোলোটা ছেলেও হয়ে থাকে তা হলে সকলেরই নাম ফটিক হয় কী করে বলতে পারো?"

বিস্ময়ে ফটিকের মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। সে বিড়বিড় করে শুধু বলল, "ষোলোজন ফটিক ঘোষ?"

নটবর রায় বললেন, "হ্যাঁ পাক্কা ষোলোজন। কে আসল কে নকল তার বিচার করার মতো সময় আমার নেই। যদি পোস্টকার্ড দেখাতে পারো তবেই বুঝব আসল লোকটা কে। তা হলে এবার তোমরা এসো গিয়ে। আমার জরুরি কাজ আছে।"

নিতাই এবার একটু সাহস করে বলল, "আচ্ছা, সবাই ফটিক ঘোষ হতে চাইছে কেন জানেন?"

নটবর রায় মাথা নেড়ে বললেন, "না হে বাপু, আমি জানি না।"

ফটিক করুণ মুখ করে বলল, "পিসির সঙ্গে একটু দেখা—"

"না হে বাপু, দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কে কার পিসি তারই ঠিক নেই। তোমরা এবার এসো।"

দু'জনে গুটি গুটি বেরিয়ে এল। দুদিন ধরে খানিক ট্রেন, খানিক বাস, তারপর মাইলের পর মাইল হেঁটে লবেজান হয়ে এত দূর আসার যে কোনও মানেই হল না, সেটা বুঝতে পেরে ফটিকের পা চলছিল না। সে অসহায় গলায় বলল, "নিতাই, কিছু বুঝতে পারলি?"

"না। তবে একটা ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কীসের ষড়যন্ত্র?"

"সেটাই ভাবছি। ষড়যন্ত্র না থাকলে মহাদেব দাস তোর কাছ থেকে চিঠিটা চালাকি করে হাতিয়ে নিত না।"

"সেটা আমারও মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। পিসির বাড়িতে ভাইপো আসবে, তার মধ্যে এত ভেজাল কীসের রে বাবা! আগে জানলে কখনও এত কষ্ট করে আসতাম না।"

ফটকের কাছে ভোজপুরি দরোয়ানটার সঙ্গে দেখা। খুব আহ্লাদের গলায় বলল, "কী খোকাবাবু, জান পহচান হোলো?"

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, "না দরোয়ানজি, উনি আমাদের পাত্তা দিলেন না। কী ব্যাপার বলতে পারেন?"

"সো হামি কুছু জানি না। লেকিন রোজ দু-চারটো করে ফটিক ঘোষ আসছে বাবুজি। ইতনা ফটিক ঘোষ কভি নেহি দেখা। নাটা ফটিক ঘোষ, লম্বা ফটিক ঘোষ, মোটা ফটিক ঘোষ, রোগা ফটিক ঘোষ, কালা ফটিক ঘোষ, ফর্সা ফটিক ঘোষ। রোজ আসছে। উসি লিয়ে বড়াবাবু কুছ পারসান মালুম হোতা।"

ফটক পেরিয়ে দু'জন ফের রাস্তায় পড়ল। ফটিক বলল, "এখন কী করা যায় বল তো! সন্ধে হয়ে গেছে, এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে যে।"

নিতাই বলল, "ভাবিস না। একটা রাত ঠিক কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এখন চল, জায়গাটা একটু ঘুরেফিরে দেখি।"

ফটিক দাঁত কড়মড় করে বলল, "মহাদেব দাসকে এখন পেলে তার মুণ্ডুটা ছিড়ে ফেলতাম। ওই লোকটার জন্যই তো এত হেনস্থা হতে হল।"

নিতাই বলল, "মাথা গরম করে লাভ আছে কিছু? দোষ তো তোরই। তুই চিঠিটা ফস করে দিয়ে ফেললি।"

"তখন কি জানি চিঠি না নিয়ে এলে পিসির বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তা ছাড়া আমরা তো ফিরেই যাচ্ছিলাম।"

"যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চোখকান খোলা রেখে চল তো, আমি একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

ক্লান্ত শরীরে তারা বেশি ঘুরতে পারল না। তবে দোগেছে যে বেশ ভাল জায়গা, সেটা বোঝা গেল।

নিতাই বলল, "গনা ডাইনির ফলার হজম হয়ে আমার এখন বেশ খিদে পাচ্ছে।"

ফটিক বলল, "আমারও। চল, ওখানে একটা বেশ ঝকঝকে মিষ্টির দোকান দেখা যাচ্ছে।"

মিষ্টির দোকানটায় বেশ ভিড়। সামনে পাতা বেঞ্চে কয়েকজন লোক বসে গল্পটল্প করছে। তারা দুজন দোকানের কাছাকাছি এগোতেই দোকানের এক ছোকরা কর্মচারী বলে উঠল, "ওই যে, ফটিকবাবু এসে গেছেন।"

নিতাই ফটিককে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "তুই এখন বিখ্যাত লোক।"

ফটিক গম্ভীর হয়ে বলল, “তাই দেখছি।”

কর্মচারীটা হাসিমুখে বলে উঠল, “ফটিকবাবু তো? পায়রাডাঙার হরিহর ঘোষের ছেলে ফটিক ঘোষ?”

যারা বেঞ্চে বসে ছিল তারা তাদের দিকে খুব তাকাতে লাগল। একজন বলে উঠল, “ওঃ, এই কয়েকদিনে যা ফটিক ঘোষ দেখলুম এমনটা আর জন্মেও দেখব না। দেশে কত ফটিক ঘোষ আছে রে বাবা!”

একজন বুড়োমানুষ বলল, “কেন হে, এই আমাদের দোগেছেতেই তো চারজন সুধীর রায় আছে। তারপর ধরো বৈরাগী মণ্ডল আছে তিনজন, পাশের গাঁ নয়নপুরে নরহরি দাস আছে পাঁচজন।”

একজন বলল, “আহা, তা বলে তো পনেরো-বিশজন করে নয়। আর সবারই বাপের নামও এক নয়।”

উত্তেজিত আলোচনা ক্রমে তর্কে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ আর তাদের খেয়াল করল না। দুজনে ভরপেট মিষ্টি খেয়ে নিল। নিতাই কর্মচারীটাকে জিজ্ঞেস করল, “ভাই, এখানে কোথাও রাতে থাকার একটু জায়গা হবে ?”

কর্মচারীটা বলল, “এখানে তো হোটেল টোটেল নেই। তবে সামনে এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের পথ ধরলে চণ্ডীমণ্ডপ দেখতে পাবে, সেখানে থাকা যাবে।”

দু'জনে উঠে পড়ল। চণ্ডীমণ্ডপটা খুঁজে পেতেও বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না। বেশ বড় আটচালা, চারদিক খোলা, তবে মেঝেটা বাঁধানো, সারাদিনের ক্লান্তির পর দু'জনে দুখানা চাদর পেতে শুয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত যে, কথাবার্তাও আসছিল না তাদের। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

চার

মাঝরাতে পায়ে সুড়সুড়ি লাগায় ধড়মড় করে উঠে বসল ফটিক, ঘুমচোখে দেখল, পায়ের কাছে একটা লোক বসে আছে। সে তাড়াতাড়ি টিনের তোরঙ্গটা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "চোর! চোর!"

সেই চিৎকারে নিতাইও ঘুম ভেঙে উঠে বসল, "কোথায় চোর? কে চোর?"

"ওই যে চোর, দেখছিস না!"

লোকটা ভারী বিরক্তির গলায় বলল, "ওঃ, কী চিল-চেঁচানিটাই চেঁচাচ্ছে দ্যাখ, যেন ডাকাত পড়েছে! তা চোর বলে কি পচে গেছি নাকি?"

লোকটার সাহস দেখে ফটিক হাঁ। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, "চোরের চেয়ে ডাকাত অনেক ভাল। তারা পা টিপে টিপে আসে না, উঁকিঝুকি মারে না, পায়ে সুড়সুড়ি দেয় না। চোরের হাবভাব অনেকটা ভূতের মতো। আর ডাকাতরা অনেক বীর, তারা বুক ফুলিয়ে আসে।"

লোকটা তেতো গলায়, "ওঃ ডাকাতের প্রশংসায় যে একেবারে নাল ঝরছে দেখছি! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ডাকাতি একটা ভদ্রলোকের মতো কাজ নাকি? কোনও আর্ট আছে ডাকাতির মধ্যে? রে-রে করে এল, গদাম গদাম করে দরজা-কপাট ভাঙল, লাঠিসোটা বন্দুক রোয়াল দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করল, তারপর লুটপাট করে চলে গল! না আছে বুদ্ধির খেলা, না কোনও হাতের সূক্ষ্ম কারিকুরি, না দূরদৃষ্টি, না রসবোধ। ডাকাতের প্রতিভার দরকার হয় না, বুঝলে? ও হচ্ছে মোটা দাগের কাজ। কিন্তু চোর হতে গেলে মগজ চাই। তেমন তেমন ভাল চোর একশো বছরে একটা জন্মায়।"

চোরের মুখে এসব শুনে ফটিকের আর কথা সরল না। নিতাই বলল, "আপনি খুব বড় চোর নাকি?"

লোকটা দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বড় হওয়া কি মুখের কথা রে। চুরি বিদ্যেও হল সমুদ্রের মতো। যতই শেখো, শেখার শেষ নেই। আমি আর কী শিখেছি বলো। সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র। নবা ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধা ছিল। বছর পাঁচেক মাত্র শাগরেদি করেছি। এখনও কত কী শেখার বাকি।"

"তা আপনি এত বড় চোর হয়ে আমাদের মতো ছোট মানুষের কাছে কী আর চুরি করবেন!"

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "এই না হলে বুদ্ধি! তোমাদের আছেটা কী বলো তো! ওই তো দুটো পলকা টিনের তোরঙ্গ আর পোটলা। ওসব তো ছিচকে চোরেও ছোবে না। চুরি করতে এলে কি পায়ে সুড়সুড়ি দিতুম?"

ফটিক বলল, "তা হলে?"

"বাঃ, গাঁয়ে নতুন কেউ এলে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে না?

কোন মতলবে আসা, কোন চক্করে ঘোরাফেরা, কাদের সঙ্গে মাখামাখি—এসব গুরুতর কথা না জানলে কি চলে?”

ফটিক বলল, “তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাদের মতলব কিছু খারাপ ছিল না। কিন্তু দোগেছেতে এসে খুব শিক্ষা হল মশাই। আপনাদের গাঁয়ে আর নয়, কাল সকালেই মানে মানে ফিরে যাচ্ছি।”

লোকটা খক করে একটা শব্দ করল। সেটা হাসিও হতে পারে, কাশিও হতে পারে। তারপর বলল, “দোগেছে যে ভাল জায়গা নয় তা আমিও মানছি। তবে কিনা দোগেছের চেয়েও বিস্তর খারাপ জায়গা আছে।”

“তাই নাকি?”

লোকটা ভালমানুষের গলায় বলল, “তা নয়? এই যে তুমি ষোল নম্বর ফটিক ঘোষ এসে উদয় হলে তার জন্য দোগেছের লোক তোমার পেছনে লেগেছে কি? কেউ তোমার মাথায় চাটিও মারেনি, বকও দেখায়নি, দুয়োও দেয়নি। দিয়েছে বলো? তা হলে দোগেছে খারাপ হল কীসে?”

“আমি মোটেই ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ নই। আমিই আসল ফটিক ঘোষ।”

“সেটা প্রমাণ হবে কীসে?”

“প্রমাণ করার দরকার নেই মশাই। পিসি আসতে লিখেছিল বলে আসা। এত ভেজাল জানলে কে এত ঝামেলা করে আসত?”

লোকটা বলল, “পিসি আসতে লিখেছিল বললে, তা সে চিঠিখানা কই?”

“চিঠিখানা খোয়া গেছে। রাসপুরের খালের ধারে মহাদেব দাস সেখানা হাতিয়ে নিয়েছে।”

“চিঠিখানার কত দাম জানো?”

“না। চিঠির আবার দাম কীসের?”

“সে আছে। যাকগে, হারিয়েই যখন ফেলেছ তখন আর কথা কী? তা এই মহাদেব দাস লোকটি কে বলো তো! কেমন চেহারা?”

“কেমন আর চেহারা! বেঁটেখাটো, কালোমতো, আমাদের ঠকিয়ে খেয়া পার করে পাঁচ টাকা আর কথার দাম হিসেবে আরও দু’টাকা নিয়েছিল।”

লোকটা খক করে ফের একটা শব্দ করল। হাসি বা কাশি যা হোক একটা হবে। তারপর বলল, “তোমাদের মতো মুরগি পেলে কে না জবাই করবে বলো! আমারই ইচ্ছে করছে। তবে কিনা আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।”

নিতাই বলল, “মহাদেব দাসকে চিনতে পারলেন?”

“না চিনে উপায় আছে! পাজি লোকদের আমি বিলক্ষণ চিনি।”

“আসলে লোকটা কে?”

“সেটা জেনেই বা কী অষ্টরম্ভা হবে?”

নিতাই গলাটা নামিয়ে বলল, “চিঠির দামের কথা কী যেন বলছিলেন?”

“বলেছি নাকি? ও হল বয়সের দোষ। মুখ ফসকে কী বলতে কী বেরিয়ে যায়।”

"বুঝেছি, আপনি আর ভেঙে বলবেন না। আচ্ছা, এই দোগেছে গাঁয়ে এত ফটিক ঘোষ কেন আসছে তা কি বলতে পারেন? আমরা যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ও বাপু, আমিও জানি না। রাম-শ্যাম-যদু-মধু কতই তো আসে।

তা তোমরা কাল সকালেই তা হলে ফিরে যাচ্ছ?"

ফটিক বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। পিসির বাড়ির যত্নআত্তি তো খুব পেলুম। ভরপেট খাওয়া জুটল না, চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে।"

"তা কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় হে!"

ফটিক গরম হয়ে বলল, "আহা, কী কেষ্টই পেলুম! আর কষ্টেরও দরকার নেই, কেষ্টরও দরকার নেই।"

নিতাই ফটিকের দিকে চেয়ে বলল, "আহা, অত মাথা গরম করিসনে তো! ইনি একটা কিছু বলতে চাইছেন, সেটা একটু বুঝতে দে।"

লোকটা একটু উদাস গলায় বলল, "না না, আমি আর কী বলব? আসার পথও খোলা আছে, যাওয়ার পথও খোলা আছে। যেতে চাও তো যেতেই পারো, কেউ তো আটকাচ্ছে না। তবে কি না—"

নিতাই মুখটা বাড়িয়ে বলল, "তবে কী?"

"এই বলছিলুম আর কী, কয়েকটা দিন এখানে থাকলে রগড়টা দেখে যেতে পারতে।"

"কীসের রগড়?"

"তা কি আমিই জানি ছাই। মনে হচ্ছে একখানা রগড় বেশ পাকিয়ে উঠছে।"

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু থাকার উপায় কী বলুন। এখানে থাকবই বা কোথায়, খাবই বা কী! আমাদের পয়সাকড়িও শেষ হয়ে আসছে।"

লোকটা একটু দোনোমোনো করে বলল, "তা থাকতে চাইলে অবশ্য একটা কাজ করতে পারো।"

"কী বলুন তো!"

"দিনের আলো ফুটলে এই রাস্তা ধরে যদি সোজা চলে যাও তো ডানহাতি প্রথম রাস্তায় মোড় ফিরে কিছুদূর হাঁটলেই গড়াই বুড়ির বাড়িটা দেখতে পাবে। পাকা বাড়ি, তবে পুরনো, গড়াই বুড়ি এই গত মাঘ মাসে পটল তোলার পর থেকে বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। বুড়ির তিন কুলে কেউ ছিল না বলে দখল হয়নি।"

ফটিক বলল, "ও বাবা, ও বাড়িতে নির্ঘাত সাপখোপ আছে।"

"গাঁয়ের ছেলে হয়ে সাপখোপ ভয় পেলে কি চলে? একটু সাবধানে থাকলে ভয়টা কীসের? চারটে দেওয়াল, মাথার ওপর ছাদ—আর চাই কী?"

নিতাই বলল, "থাকার ব্যবস্থা না হয় হল, কিন্তু খাওয়া?"

"দোগেছেকে যতটা খারাপ জায়গা বলে ভেবেছ, ততটা কিন্তু নয়। কুমোরপাড়ার মোড়ে নুটুবাবুর লঙ্গরখানা দেখতে পাবে। দু'বেলা গরম ভাত, ডাল, তরকারি।

ফটিক নাক সিটকে বলল, "লঙ্গরখানা ! সেখানে তো ভিখিরিরা খায়।"

লোকটা নির্বিকারভাবে বলল, "তা খায়। ভিখিরিরা যায় বলে কি বাবুদের গালে উঠছে না নাকি? এঃ, যেন নবাবপুত্তুর এলেন। কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে গুচ্ছের চপ, শিঙাড়া, জিলিপি,অমৃতি গিলে পেট গরম করার চেয়ে নুটুবাবুর লঙ্গরখানার গরম গরম ডালভাত কি খারাপ হল?"

নিতাই বলল, "না না, নুটুবাবুর লঙ্গরখানাই ভাল কিন্তু আমরা যে কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে চপ, শিঙাড়া, জিলিপি আর অমৃতি খেয়েছি তা আপনি জানলেন কী করে?"

লোকটা তেমনই নির্বিকার গলায় বলল, "চোখকান খোলা রাখলেই জানা যায়। তোমাদের দোষ কি জানো? ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন,একজোড়া কান দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতেই শিখলে না। ছ্যাঃ ছ্যাঃ যাকগে, ভোর হয়ে আসছে। আমি চলি।"

নিতাই বলল, "আপনার নামটা তো জানা হল না।"

লোকটা মাথা চুলকে বলল, "নাম! এই তো মুশকিলে ফেললে, কোন নামটা বলি বলো তো!"

"যেটা খুশি।"

"তা হলে তোমরা আমাকে নদিয়াদা বলে ডাকতে পারো। তবে বেশি খোঁজখবর করতে যেও না, তা হলে বিপাকে পড়বে। দরকারমতো আমি উদয় হব'খন।"

ফটিক হঠাৎ বলল, "গড়াই বুড়ির বাড়িতে তালা দেওয়া থাকলে ঢুকব কী করে? লোকে যদি চোর বলে ধরে?"

"তালাটালা নেই, দড়ি দিয়ে কড়া দুটো বাঁধা আছে। আর যদি লোকে চোর বলে ধরে ঘা-কতক দেয়ই, তা হলে হাসিমুখে সেটা হজম করে নিও। হাটুরে কিল খেলে মানুষ পোক্ত হয়। আর একটা কথা। পুষ্যিপুত্ত্বরকে খুব হুঁশিয়ার।"

এই বলে লোকটা উঠে অন্ধকারে ফুস করে মিলিয়ে গেল। ফটিক বলল, "ধ্যেত, এ লোকটা আমাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে।"

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের ফাঁদে ফেলে কী লাভ? আমাদের আছেটা কী বল তো! কিন্তু পুষ্যিপুত্ত্বরটা আবার কে?"

"কে জানে! চোরছ্যাঁচড়ের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক নয়। চল, আমরা ফিরেই যাই।"

"ফিরে যাওয়া তো আছেই। কিন্তু রহস্যটা কী, কেন এত ফটিক ঘোষ এখানে আসছে সেটা তো আর জানা হবে না, লোকটা হঠাৎ পুষ্যিপুত্তুরের কথাই বা বলে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে, একটু কষ্ট করে দুটো-একটা দিন থেকে যাওয়াই ভাল।"

ফটিক একটু গাইগুই করে রাজি হল। বলল, "কিন্তু বিপদ আপদ হলে কিন্তু তুই দায়ী।"

"বিপদআপদ তো কপালে আছেই মনে হচ্ছে। আর সেইজন্যই আমার মনটা চনমন করছে। পায়রাডাঙা ফিরে গিয়ে কোন লবডঙ্কা হবে বল তো!"

ফটিক একটু ভেবে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তা ঠিক।"

পাঁচ

সকালের আলো ফুটতেই দু’জনে বেরিয়ে পড়ল, সোজা বেশ খানিকটা গিয়ে ডানধারে একটা কাঁচা রাস্তা। লোকবসতি বিশেষ নেই। বড় বড় গাছের ছায়ায় রাস্তাটা অন্ধকার হয়ে আছে। প্রথমদিকে দু-চারখানা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আরও এগোতেই লোকবসতি শেষ হয়ে আগাছার জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ ধারে ছাড়া-ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে একখানা ছোট পাকা ঘর দেখতে পাওয়া গেল। দেওয়াল নোনা ধরেছে, দেওয়ালের ফাটলে অশ্বথ গাছ গজিয়েছে। দিনের বেলাতেও ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ভারী থমথমে জায়গা।

দু'জনে একটু থমকাল। এভাবে পরের বাড়িতে ঢোকার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, “ঢোকাটা কি ঠিক হবে রে নিতাই? ভাল করে ভেবে দ্যাখ।”

নিতাই বলল, “আর উপায়ই বা কী বল। কপালে যা আছে হবে। আয় তো দেখি।”

ফটিক বলল, “জায়গাটার কেমন ভূত-ভূত চেহারা।”

বাধো-বাধো পায়ে দু'জনে হাটুভর চোরকাঁটার জঙ্গল পেরিয়ে গড়াইবুড়ির ঘরের দরজা খুলে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে পেছনে হঠাৎ কে যেন ফিচ করে একটু হাসল। দু’জনে পেছন ফিরে দেখল একজন সুড়ঙ্গে রোগা বুড়োমতো লোক ফোকলা মুখে খুব হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তেই বলে উঠল,“কী মতলব হে, কী মতলব? দেবেখন গড়াইবুড়ি পিণ্ডি চটকে বলি গোবিন্দ সাউয়ের মতো ডাকসাইটে লোকই আজ অবধি দখল নিতে পারল না, আর তোমরা কোথাকার কে এসে ঢুকে পড়ছ যে বড়? এই আমি চললুম গোবিন্দ সাউকে খবর দিতে।”

বলে লোকটা হনহন করে হেঁটে ডানধারে কোথায় চলে গেল। ফ্যাকাসে মুখে ফটিক বলল, “এই রে! কাকে যেন খবর দিতে গেল? এবার কী হবে রে নিতাই?”

নিতাইও একটু ঘাবড়ে গেছে। তবু সাহস করে বলল, “কী আর হবে! যদি বের করে দেয় তো দেবে। আমরা বলব নিরাশ্রয় হয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।”

“তোর বড্ড সাহস।”

নিতাই দরজার দড়ি খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে ফটিক। ঘরদোরের অবস্থা যতটা খারাপ হবে বলে তারা ভেবেছিল, দেখা গেল ততটা নয়। মেঝেয় ধুলো জমে আছে ঠিকই, একটু ঝুলও পড়েছে চারধারে, তবে বসবাসের অযোগ্য নয়। ঘরে দু’খানা খাটিয়া আছে, গেরস্থালির জিনিসপত্রও কিছু পড়ে আছে। ভেতরদিকে উঠোনে পাতকুয়ো, দড়ি বালতি সবই পাওয়া গেল।

ফটিক বারবার বলতে লাগল, “কাজটা ঠিক হচ্ছে না রে নিতাই।”

নিতাই ঠাণ্ডা গলায় বলল, “তোর মতো কিন্তু আমার ভয় করছে না। গনা ডাইনি যদি আমাকে ঘোড়া বানিয়ে ফেলত বা অষ্টভুজার মন্দিরে যদি সত্যিই বলি

হয়ে যেতুম তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে বল। আয় আগে চানটান করে একটু তাজা হই, তারপর যা হওয়ার হবে।”

দু'জনে সবে স্নান সেরে এসে জামাকাপড় পরেছে, এমন সময় বাইরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। দু’জনে কানখাড়া করে শুনল কে যেন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বলছে, “কে রে, কার এত সাহস যে, এ-বাড়িতে বলা নেই, কওয়া নেই ঢুকে বসে আছে? কার এত বুকের পাটা? অ্যাঁ!”

দরজায় দমাদম শব্দ শুনে ফটিক ফের ফ্যাকাসে হয়ে বলল, “ওই যে! এসে গেছে।”

নিতাই গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দেখল, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর গায়ে নামাবলী জড়ানো একটা ষণ্ডামতো লোক দাঁড়িয়ে। তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, “কে তুই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছিস? জানিস এ-বাড়ি এখন কার দখলে?”

নিতাই বিগলিত একটু হেসে বলল, “এ-বাড়ি কি আপনার?”

“আমার নয় তো কার? গড়াইবুড়িকে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে এ-বাড়ি কবে কিনেছি আমি। দলিল আমার সিন্দুকে। তোরা কোন সাহসে এ-বাড়িতে ঢুকেছিস?”

বলে লোকটা লাফ দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর পিছু ফিরে হাঁক মারল, “ওরে ও বিশু, লাঠিটা নিয়ে আয় তো দেখি—”

বেঁটেখাটো চেহারার একটা লোক মস্ত একটা লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে এল।

ফটিক তাড়াতাড়ি বলল,“আহা, লাঠিসোঁটার দরকার কি মশাই? আমরা না হয় এমনিতেই যাচ্ছি।”

গোবিন্দ সাউ মুখ ভেঙিয়ে বলল, “এমনিতেই যাচ্ছি মানে? যাবে তো বটেই, তোমার ঘাড়ে যাবে। আগে বলো কার হুকুমে ঢুকেছ ? এত সাহস হয় কোথা থেকে? অ্যাঁ!”

এইসব চেঁচামেচির মাঝখানে হঠাৎ খাটিয়ার তলা থেকে একটা পেতলের ঘটি হঠাৎ লাফ মেরে শূন্যে উঠল, তারপর উড়ে গিয়ে ঠঙাত করে গোবিন্দ সাউয়ের কপালে লাগল।

“বাপ রে!” বলে গোবিন্দ সাউ কপাল চেপে বসে পড়ল মেঝেতে। তারপর চেঁচাতে লাগল, “মেরে ফেলেছে রে! খুন করে ফেললে রে!”

নিতাই আর ফটিক হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারা কেউ ঘটিটা ছুড়ে মারেনি। তা হলে কাণ্ডটা হল কী করে?

বাইরে থেকে বিশু বলল,“পালান বাবু, গড়াইবুড়ি ফের খেপেছে।”

গোবিন্দ সাউ কোনওক্রমে দরজার বাইরে গিয়ে ফের গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, “তোর এত সাহস গড়াইবুড়ি? মরেও তেজ যায়নি তোর?”

বিশু গোবিন্দর হাত ধরে টেনে বলল, “চলে আসুন বাবু, ভূতপ্রেতের সঙ্গে কি লড়াই করে পারবেন? বেঘোরে প্রাণটা যাবে।”

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলল, "নিকুচি করেছে প্রাণের। প্রাণ যায় তো যাক। এই শুনে রাখ গড়াইবুড়ি, তোকে এই ভিটে থেকে উচ্ছেদ যদি না করি তো আমার নাম গোবিন্দ সাউ নয়। আমি এ-বাড়িতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাব, তারপর কীর্তনের দল এনে অষ্টপ্রহর এমন কীর্তন করাব যে, তুই পালানোর পথ পাবি না—"

কথার মাঝখানেই হঠাৎ উঠোনের নারকেল গাছ থেকে একটা বুনো নারকেল বোটা ছিড়ে সাঁ করে ছুটে এসে গোবিন্দ সাউয়ের মাথায় পটাত করে লাগল। গোবিন্দ চিতপাত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল, "গেছি রে! ওরে, আমি যে চোখে অন্ধকার দেখছি—"

নারকেল দেখে বিশু দুই লাফে রাস্তায় পড়ে ছুটে উধাও হয়ে গেল।

নিতাই আর ফটিক কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হাঁ করে কাণ্ডটা দেখল। তারপর ফটিক বলল, "এসব কী হচ্ছে রে নিতাই! ভূতুড়ে কাণ্ড যে !"

নিতাই বলল, "তাই দেখছি।" কিছুক্ষণ মুর্ছার মতো পড়ে থেকে গোবিন্দ হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের কিছু করেনি গড়াইবুড়ি?"

নিতাই বলল, "না তো!"

বাঁ হাতে কপাল আর ডান হাতে মাথা চেপে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় উঠে গোবিন্দ তাদের দিকে চেয়ে বলল, "আর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে না যাও তা হলে কিন্তু আমি থানা থেকে পেয়াদা আনিয়ে—"

কথাটা ভাল করে শেষ হয়নি, কোথা থেকে একটা ডাঁশা পেয়ারা ছুটে এসে গোবিন্দর ডান গালে খচাত করে লাগল।

"বাপ রে!" বলে গোবিন্দ ঘোড়ার বেগে দৌড়ে পালাল।

"হুঁ। গড়াইবুড়ি গোবিন্দ সাউকে পছন্দ করে না।"

"কিন্তু আমাদের করে।"

ফটিক চোখ বড় বড় করে বলল, "তা বলে কি ভূতের বাড়িতে থাকা ভাল?"

"ভূত যদি ভাল হয় তবে অসুবিধে কী?"

ঠিক এই সময়ে সেই সুড়ঙ্গে লোকটা ফিরে এসে রাস্তা থেকে হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে বলল, "এ কী! তোমাদের ঘাড় এখনও মটকায়নি!"

নিতাই বলল, "আজ্ঞে না।"

"বলো কী হে! এই যে দেখলুম গোবিন্দ সাউ ছুটে পালাচ্ছে! তার মাথায় আলু, গালে টিবি, কপাল থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, আর তোমাদের গায়ে যে বড় আঁচড়টিও পড়েনি। না না, এ গড়াইবুড়ির ভারী অন্যায়। এটা ভারী একচোখোমি। আজ অবধি কেউ এবাড়িতে ঢুকতে পারেনি, তা জানো? চোরছ্যাঁচড় অবধি নয়। গড়াইবুড়ির তাড়া খেয়ে সবাইকেই সটকাতে হয়েছে। তা হলে তোমাদের বেলায় অন্যরকম নিয়ম হবে কেন? এটা একটা বিচার হল? এতে কি গড়াইবুড়ির ভাল হবে?"

ঠিক এই সময়ে ভেতরের উঠোন থেকে একটা চেলাকাঠ উড়ে এসে ধাই করে লোকটার পায়ের গোছে লাগতেই লোকটা "রাম রাম রাম রাম" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে জিরাফের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হয়ে গেল।

নিতাই দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। তারপর চোখ বুজে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "পেন্নাম হই গড়াইঠাকুমা। এ পর্যন্ত তো আমাদের দিকটা ভালই দেখলে, বাকি কয়েকটা দিনও একটু দেখো। আতান্তরে পড়ে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছি ঠাকুমা, কিছু মনে কোরো না।"

দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে গড়াইবুড়িকে পেন্নাম করে বলল, "আমি একটু ভিতু মানুষ গড়াইঠাকুমা। ফস করে আবার রাতবিরেতে দেখাটেখা দিয়ে বোসো না। তাতে পিলে চমকে হার্টফেল হয়ে যেতে পারে। এ যা খেল দেখালে তাতে কালী-দুর্গা কোথায় লাগে। শ্রীচরণে পড়ে রইলুম ঠাকুমা, একটু খেয়াল রেখো।"

তারা গাঁয়ের ছেলে, খিদে একটু বেশিই। তার ওপর দোগেছের জলবায়ুর গুণ আর কালকের ধকলে দু'জনেরই খিদে চাগাড় দেওয়ায় মুখোমুখি দুটো খাটিয়ায় বসে তারা নিজেদের পয়সাকড়ি গুনেগেঁথে দেখল। মোট ত্রিশ টাকা আছে। এ থেকে ফেরার ট্রেনভাড়া রেখে যা থাকবে তা কহতব্য নয়।

নিতাই বলল, "দ্যাখ যদি কচুরি-জিলিপি বা মণ্ডা-মিঠাই জলখাবার খাই তা হলে এ টাকা ফুস করে ফুরিয়ে যাবে। আর যদি চিড়েগুড় খাই তা হলে কষ্টেসৃষ্টে কয়েকদিন চলতে পারে।"

ফটিক গম্ভীর মুখে বলল, "হুঁ।"

এ সময়ে হঠাৎ ঘরের পাটাতনের ওপর থেকে দুম করে একটা বড়সড় মাটির ঘট মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। আর রাশিরাশি খুচরো টাকাপয়সা ঝনঝন করে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল।

ফটিক চমকে উঠে বলল, "এ কী রে বাবা?"

নিতাই অবাক হয়ে মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের চোখ বুজে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে বলল, "গড়াইঠাকুমা, এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেললে! আর জন্মে কি আমরা তোমার সত্যিকারের নাতি ছিলুম?"

ফটিক বলল, "পরের পয়সা নেওয়া কি ঠিক হবে রে নিতাই?"

"পর! পর কোথায়? ঠাকুমা বলে ডেকেছি না! গড়াইঠাকুমার টাকা তো আর স্বর্গে যাবে না। নিজের গরজে দিচ্ছেন, না নিলে কুপিত হবেন যে!"

"ও বাবা! তা হলে আয় কুড়োই।"

গুনেগেথে দেখা গেল, মোট তিনশো বাইশ টাকা। নিতাই বলল, "ওঃ, গড়াইঠাকুমার দেখছি দরাজ হাত।"

ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, "বড় দরাজ, এতটা কি ভাল? বিশ পচিশ টাকা হলেও না হয় কথা ছিল। তা বলে এত?"

ছয়

দু'জনে পথে বেরোতেই কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। মুখোমুখি যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সেই তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে তাদের নমস্কার করে চট করে রাস্তার পাশে সরে যাচ্ছে। কেউ কেউ গাছপালার আড়ালে লুকিয়েও পড়ল। চণ্ডীমণ্ডপের কাছটায় এক মহিলা বছর পাঁচেকের একটা ছেলেকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, টক করে সে নিচু হয়ে ছেলেটার চোখে হাতচাপা দিয়ে বলল, "ওরে, ওদের দিকে তাকাসনি, গুণ করে ফেলবে।"

ফটিক বলল, "এসব কী হচ্ছে বল তো!"

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "উঁহুঁ, বোঝা যাচ্ছে না।"

আজ কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকতেই কালো আর মোটামতো মালিক তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্স ছেড়ে উঠে হাতজোড় করে বলল, "আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য! ওরে, হাতলওলা চেয়ারদুটো এগিয়ে দে।"

ফটিক আর নিতাই একটু মুখ-তাকাতাকি করে নিল, গরম কচুরি আর জিলিপি খাওয়ার পর দাম দিতে যেতেই মালিক জিভ কেটে বলল, "আরে ছিঃ ছিঃ! দাম কীসের? দামটাম দিতে হবে না, বরং গরম সন্দেশ হয়েছে, কয়েকখানা করে খেয়ে যান।"

ফটিক মৃদুস্বরে ডাকল, "নিতাই।"

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "উঁহুঁ, এখনও বোঝা যাচ্ছে না।"

দরোয়ানটা অবধি অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায় একটা লম্বা মিলিটারি স্যালুট দিল।

তখন সেখানে বেজায় ভিড়, কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যেও তাদের সবাই খাতির করে পথ তো ছেড়ে দিলই, তার ওপর লঙ্গরখানার ম্যানেজারমশাই তাদের দেখেই শশব্যস্তে উঠে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন, "ওরে ও জগা, শিগগির ওপরের ঘরে জলের ছিটে দিয়ে দুটো আসন পেতে দে আর ভি আই পি-দের জন্য রাখা কাসার থালা-গেলাস বের কর। ঠাকুরকে বেগুন ভাজতে বল, আর ঘি-টা গরম করে দিতে যেন ভুল না হয়, দেখিস বাবা।"

"নিতাই।"

"উঁহুঁ, বোঝা যাচ্ছে না।"

খেয়েদেয়ে বেরোনোর সময় ম্যানেজার হাত কচলে বললেন, "রাতে আপনাদের জন্য একটু পোলাও আর কষা মাংস হচ্ছে। হেঃ হেঃ। একটু দই মিষ্টিও—"

"আচ্ছা, আচ্ছা।" বলে দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

বাজারের কাছ বরাবর একটা দোকানঘরের পেছন থেকে একটা লোক ফস করে বেরিয়ে এসে ভারী বিগলিত মুখে সামনে দাঁড়াল, "পেন্নাম হই বাবারা, দণ্ডবত, তা আপনিই তো ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ বাবা! তাই না?"

ভারী ছোটখাটো চেহারার, ধুতি আর হাফশার্ট পরা লোকটাকে দেখে ফটিক অবাক হয়ে বলে, "ষোলো নম্বর হতে যাব কোন দুঃখে? আমি শুধু ফটিক ঘোষ।"

"তবু দেগে রাখা ভাল। নইলে এত ফটিক ঘোষের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলব যে"

"অ! আর কিছু বলবেন?"

খুব হেঁঃ হেঁঃ করে হেসে হাত-টাত কচলে লোকটা বলে, "অধমের নাম রসিক বৈরাগী। এই পেন্নাম জানাতেই আসা। এত বড় দু'জন গুনিন এসেছেন গাঁয়ে, পেন্নাম জানাতে হবে না? তা বাবা, ভূতের মন্তর তো দেখলুম আপনাদের জলভাত, আর মারণ-উচাটনবশীকরণ তো ধরছিই না, ও তো আপনাদের নস্যি। বলি বাবা, এই বাটি-চালান-ঘটি-চালান-নখদর্পণ, ডাকিনী বিদ্যে এসবও কি আসে বাবা?"

ফটিক অবাক হয়ে বলল, "ভূতের মন্তর জানি না তো! আর যা যা বললেন সেসবও জানি না।"

"হেঁঃ হেঁঃ, কী যে বলেন বাবা! বিদ্যে কি লুকোনো যায়? জলবসন্ত হলে কি গুটি লুকোনো যায়? না কি সর্দি লাগলে কাশি লুকোনো যায়? না কি আমাশা হলে বেগ চেপে রাখা যায় বাবা? বিদ্যে হল ওই জিনিস, ও বেরিয়ে পড়বেই। কাল যখন আপনারা গাঁয়ে এসে ঢুকলেন বাবা, তখনই আমি গন্ধটা পেয়েছিলুম।"

নিতাই অবাক হয়ে বলে, "কীসের গন্ধ?"

"আজ্ঞে, অনেকটা মাছের চারের গন্ধ। বড় বড় গুনিনের গায়ে থাকে, ওই গন্ধে ভূত-প্রেত-অপদেবতারা সব তফাত যায়। বাতাস শুকে তখনই আমি আমার ছোট শালাকে ডেকে বলেছিলুম, ওরে রেমো, এই যে দুজন মানুষ এসে গাঁয়ে ঢুকল এরা যেমন তেমন মনিষ্যি নয় রে। চেহারা দেখে বোঝবার জো নেই, কিন্তু ছুঁচো যেমন গায়ের গন্ধ চেপে রাখতে পারে না, গুনিনরাও তাই।"

ফটিক বলল, "বটে!"

"হেঁঃ হেঁঃ, যতই নিজেকে লুকিয়ে রাখুন বাবা, বিদ্যে লুকোনোর উপায় নেই। গড়াইবুড়ি মরে ইস্তক ও বাড়ির ত্রিসীমানায় কি কেউ যেতে পেরেছে, বলুন তো! কত বড় বড় ওস্তাদ, গুনিন, ওঝা এসেছে, কেউ পারেনি। ঢিল পাটকেল খেয়ে সব পালানোর পথ পায় না। আর আপনারা কেমন ছুঁচ হয়ে ঢুকলেন, আর ফাল হয়ে বেরিয়ে এলেন, গায়ে আচড়টিও পড়ল না, বিদ্যে না থাকলে কি হয় এসব? আমরাও ছোটখাটো বিদ্যের চাষ করি কিনা, তাই জানি।"

নিতাই বলল, "তা আপনার কী করা হয়?"

ভারী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে রসিক বলল, "সে-কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জাই করে বাবা। পেটের দায়ে রাত বিরেতে বেরোতে হয়। ছোটখাটো হাতের কাজ আর কী! তাও কি শাস্তি আছে বাবা? সতীশ দারোগা এসে ইস্তক আমাদের ব্যবসাই লাটে উঠবার জোগাড়। কখন যে কোন রূপ ধরে কোথায় উদয় হবেন তার কোনও ঠিক নেই। বোষ্টম সেজে, কাপালিক সেজে, পুরুত সেজে, এমনকী চোর-ডাকাত সেজেও ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

ফটিক বলল, "বটে! দারোগা যে আবার চোর-ডাকাত সেজেও ঘুরে বেড়ায়, এ তো কখনও শুনিনি।"

"আর কবেন না বাবা, তাকে জাম্বুবান বললেও কম বলা হয়, তক্কে তক্কে থাকেন, কখন যে ফ্যাক করে কার ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে যান, সোঁদরবনের বাঘের মতো, তার ঠিক নেই। অথচ দেখুন, দু' পা এগিয়ে মনসাপোতার মোড় পেরোলেই গজপতি দারোগার এলাকা। যেমন তাঁর নাদুসনুদুস চেহারা, তেমনই হাসিখুশি মুখখানি। দেখলেই বুক ঠাণ্ডা হয়। চোর-ডাকাতের মা-বাপ। যা খুশি করুন কেউ ফিরেও তাকাবে না। যত অবিচার সব এই সতীশ দারোগার এলাকায়। এই আমরা দু-চারজনই মাটি কামড়ে পড়ে আছি, যত বড় কারিগররা সব ওই গজপতির এলাকায় গিয়ে সেঁদিয়েছে।"

"তা আপনি যাননি কেন?"

"সেখানে যে বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে বাবা! অত কারিগর জুটেছে তো, আমাদের মতো চুনোপুটির সেখানে সুবিধে হচ্ছে না।"

"তা হলে তো আপনার খুব মুশকিল হয়েছে দেখছি।"

"খুব, খুব, দিনকাল মোটে ভাল যাচ্ছে না। এই এখন আপনারা দুটিতে এসেছেন, যদি মারণ-উচাটন-বাণ-বশীকরণ দিয়ে সতীশ দারোগাকে একটু চিট করতে পারেন তা হলে গরিবের বড্ড উপকার হয়।"

নিতাই বলল, "সে আর বেশি কথা কী? দেবখন টিট করে।"

"আর একটা কথা বাবা। দুলুবাবু আপনাদের সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। বড় মনস্তাপে ভুগছেন।"

ফটিক অবাক হয়ে বলে, "দুলুবাবু কে?"

রসিক হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, "প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ, লোকে বলে এ-তল্লাটের নবীন হুড না কী যেন।"

"রবিনহুড নাকি?"

"আজ্ঞে, তাই হবে।"

"তা তাঁর মনস্তাপ কীসের?"

"বড্ড মনস্তাপ। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর বলছেন, ওরে মহাদেব, তুই এটা কী করলি? চিঠিখানা নিয়ে চলে এলি? আর অবোধ ছেলে দুটো চিঠিখানা দেখাতে পারেনি বলে কী হেনস্থাটাই না হল!"

ফটিক ফুঁসে উঠে বলল, "মানে! কোন চিঠি?"

"আমি তো অত জানি না বাবা, যা শুনেছি তাই বলছি, কী একখানা চিঠি নাকি আপনাদের কাছ থেকে দুলুবাবুর শাগরেদ মহাদেব দাস নিয়ে এসেছিল, আর তাতে নাকি আপনাদের বড্ড নাজেহাল হতে হয়েছে।"

"সে তো বটেই। মহাদেব দাস অতি পাজি লোক।"

"আজ্ঞে, সেই চিঠিখানা দুলুবাবু ফেরত দিতে চান, আমাকে ডেকে বললেন, ওরে, ছেলে দুটোকে সাঁঝের পর একটু আসতে বলিস তো, ওদের কষ্ট দিয়ে

আমার বড় পাপ হচ্ছে!”

ফটিক বলে, “তা সাঁঝের পরে কেন, এখনই যাচ্ছি চলুন।”

জিভ কেটে রসিক দাস তাড়াতাড়ি বলল, “দিনমানে তাঁর সুবিধে নেই কিনা, দিনমানে তিনি গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন।”

“কেন বলুন তো!”

রসিক একটু হেঁঃ হেঁঃ করে হেসে নিল। ফটিক আর নিতাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে নিল। রসিক বৈরাগী মিটমিট করে চেয়ে বলল, “দিনমানে ঘরের বাইরে পা দেওয়ার কি জো আছে তাঁর? অত বড় গুণী মানুষ, চারদিকে এত নামডাক। লোকে একেবারে ছেঁকে ধরে, হাঁ করে চেয়ে থাকে, পায়ের ধুলো নিতে কড়াকড়ি, অটোবায়োগ্রাফি চায়।”

“অটোবায়োগ্রাফি? না অটোগ্রাফ?”

“ওই হল। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। আসল কথা হল, দুলুবাবু যখন-তখন হুট বলতে দেখা দেন না। একটু আবডালে থেকে নানা কলকাঠি নাড়াচাড়া করেন। আমি ওঁরই শ্রীচরণের আশ্রয়ে থেকে তালিম নিচ্ছি কিনা।”

ফটিক বলল, “বুঝেছি, চিঠিটা আমাদের খুব দরকার। তা কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে ?”

“এই পুবদিকের রাস্তায় গিয়ে বটতলা থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে দু’ ফার্লং, একখানা শিবমন্দির আছে। সেইখানে। তা বাবারা, আমি সাঁঝের পর এখানে হাজির থাকবখন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।”

“তা হলে তো খুবই ভাল হয়।”

রসিক বৈরাগী বিদায় নেওয়ার পর নিতাই বলল, “কাজটা কি ঠিক হবে রে ফটিক ? দুলু গোসাঁইয়ের কথা যা শুনলুম তাতে খুব সুবিধের ঠেকছে না।”

“চিঠিটা যখন ফেরত দিতে চাইছে তখন একবার গিয়ে দেখলে হয়।”

“চিঠিটা তে রসিকের হাত দিয়েই পাঠাতে পারত।”

ফটিক একটু ভেবে বলে, “তা ঠিক। তবে চিঠিটা পেলে পিসির সঙ্গে দেখাটা হয়, নইলে ফিরে গিয়ে বাবাকে কী বলব বল তো।”

এই দোনোমোনো ভাব নিয়েই সন্ধের পর দু'জনে ফের বাজারের কাছটায় আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারা যে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে তা লোকজনের হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাদের দেখতে পেলেই মানুষজন তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে হেঁঃ হেঁঃ করে সরে পড়ছে।

“লোকে কি আমাদের একটু ভয়ও পাচ্ছে রে নিতাই?”

“তা পাবে না? ভূতের মন্তর জানি যে।”

“জীবনে কখনও কেউ আমাকে ভয় পায়নি, খাতিরও করেনি। নিজেকে এখন বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে।”

সন্ধে গড়িয়ে একটু রাত হওয়ার পর যখন দোকানের ঝাপটাপ বন্ধ হতে লাগল, লোকজন কমে গেল, তখনই একটা দোকানঘরের আড়াল থেকে চাপা

গলায় ডাক এল, “বাবারা এই ইদিকে আসুন। বেশি সাড়াশব্দ করার দরকার নেই।”

তারা নিঃশব্দে কাঁচা রাস্তাটা ধরে রসিকের পিছু পিছু চলতে লাগল। কিছুটা যেতেই ঘরবাড়ি শেষ হয়ে ঝোপজঙ্গল শুরু হল। ঝিঁঝিঁর শব্দ, প্যাঁচার ডাক আর ঘোর অন্ধকার।

ফটিক বলল, “আর কতদূর, ও রসিকবাবু?”

“এই আর একটু বাবা।”

কম করেও মাইলখানেক রাস্তা পেরিয়ে তারা যেখানে এল সেটা রীতিমত জঙ্গল। সামনে বিশাল একটা বটগাছ।

“এই বটতলা বাবা। এবার ডাইনে। চিন্তা নেই, আমার পিছু পিছু চলে আসুন।”

ডানদিকের রাস্তায় ঢুকতেই ফটিক আর নিতাইয়ের গা ছমছম করতে লাগল। বিশাল বড় বড় ঝুপসি গাছের ছায়া, দু'ধারে দেড় মানুষ সমান উঁচু আগাছার জঙ্গল। প্যাঁচা ডাকছে, তক্ষকের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একঝাঁক শিয়ালের দৌড়, পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। অন্ধকারে হোঁচট খেতে হচ্ছে বারবার।

ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, “এ কোথায় আনলেন রসিকবাবু?”

“কোনও ভয় নেই বাবা, এ রাস্তায় আমার দিনে-রেতে যাতায়াত ”

“আর কতদূর?”

“এই আর একটু।”

নিতাই জিজ্ঞেস করে, “দুলুবাবু লোকটি কেমন বলুন তো?”

“আহা বড় দুভার্গা লোক। সব থেকেও কিছু নেই। কপালের ফেরে আলায় বালায় ঘুরে জীবন কাটছে। অতবড় সম্পত্তি পড়ে আছে, অত টাকা, কিন্তু সেই কার যেন ভাজা শোলমাছ হাত ফসকে পালিয়ে গিয়েছিল। দুলুবাবুর সেই অবস্থা।”

“তা বিষয়সম্পত্তির কী হল?”

“সে বড় দুঃখের কথা বাবা। তিনি ছিলেন রায়মশাইয়ের পুষ্যিপুত্তুর। যেমন-তেমন নয়, লেখাপড়া করা পুষ্যিপুত্তুর। পাঁচ বছর বয়সে পুষ্যিপুত্তুর হলেন, আর কুড়ি বছর বয়সেই ত্যাজ্যপুত্তুর।”

পুষ্যিপুত্তুর শুনে ফটিক চাপা গলায় বলল, “হ্যাঁ রে নিতাই, নদিয়াদা না এক পুষ্যিপুত্তুর সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলেছিল?”

কথাটা শুনতে পেয়ে রসিক থমকাল, “কার কথা বলছেন বাবা?”

নিতাই বলল, “নদিয়া নামে কাউকে চেনেন? আপনাদের লাইনেরই লোক।”

অবাক গলায় রসিক বলে, “না তো, এ নামে তো কেউ নেই। কোথায় দেখা হল তার সঙ্গে?”

“কাল রাতে, চণ্ডীমণ্ডপে।”

“চেহারাটা কেমন বাবা?”

“অন্ধকারে আবছা দেখা। লম্বাচওড়া বলেই মনে হল।”

রসিক হঠাৎ “দাঁড়ান বাবা, পেছনের দিকটা একটু দেখে আসি” বলে ফস করে অন্ধকারে উলটোদিকে মিলিয়ে গেল।

ফটিক চাপা গলায় বলে, “আমার একটু ভয়-ভয় করছে।”

“সে আমারও করছে।”

“পালাবি?”

“এই অন্ধকারে পালানোও কি সোজা? যদি পালাই তা হলে ঘটনাটা জানাও হবে না।”

রসিক ফিরে এসে বলল, “চলুন বাবা।”

“পেছনে কী দেখে এলেন?”

“দিনকাল ভাল নয় বাবা, কেউ পিছুটিছু নিয়েছে কিনা সেটাই একটু দেখে এলুম।”

ফটিক জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা এই রায়মশাইটি কে বলুন তো?”

“আজ্ঞে নটবর রায়, আপনার পিসেমশাই।”

ফটিক অবাক হয়ে বলে, “তার আবার পুষ্যিপুত্তুরও ছিল নাকি?”

“যে আজ্ঞে। রায়মশাইয়ের ছেলেপুলে নেই, অগাধ ধনসম্পত্তি, তাই হরিরামপুরের আশুবাবুর ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। তিনিই দুলুবাবু।”

“ তা বলে ত্যাজ্যপুত্তুর করলেন কেন?”

“সেও দুঃখের কথা বাবা। রায়মশাইয়ের মায়াদয়া বলে কিছু নেই। পনেরো বছর পেলে পুষে তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। দোষের মধ্যে দুলুবাবু একটু ফুর্তিবাজ ছিলেন আর কী।”

“শুধু সেইজন্য?”

“যে আজ্ঞে। বড্ড অবিচার হয়েছে বাবা।”

নিতাই বলল, “আর কত দূর?”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“এসে গেছি বাবা, ওই যে শিবমন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে।”

অন্ধকারে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে আবছা আকাশের গায়ে একটা মন্দিরের চুড়া অস্পষ্ট দেখা গেল। মিনিটখানেক হেঁটে তারা মন্দিরের চত্বরে ঢুকল। চারদিক সুনসান। কোথাও কোনও আলোর রেশমাত্র নেই।

ফটিক সভয়ে বলল, “কই, কেউ তো কোথাও নেই?”

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু বাতাসে খুব মৃদু একটা শব্দ হল যেন। আর তারপরেই কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা ভারী লাঠি ফটিকের বা কাঁধে এত জোরে এসে লাগল যে, সর্বাঙ্গে তীব্র ব্যথার একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল তার। চোখে অন্ধকার দেখে সে বসে পড়ল। হঠাৎ চারদিক থেকে ঝপাঝপ লাঠি নেমে আসছিল।

কিন্তু এতসব লাঠি সোঁটার মাঝখানে হঠাৎ ফটিকের হাতেও একটা লাঠি কী করে যেন চলে এল। লাঠিটা হাতে পেয়েই সে লাফিয়ে উঠে দমাদম চার দিকে লাঠি চালাতে লাগল। জীবনে সে কখনও লাঠিস্পর্শ করেনি কিন্তু এখন দিব্যি সে পাখসাট মেরে লাঠি চালাচ্ছে দেখে নিজেই ভারী অবাক হয়ে গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয়, অন্ধকারে অন্তত দশ-বারোটা লেঠেল তাদের ঘিরে ধরে লাঠি চালাচ্ছে বটে, কিন্তু আর একটাও লাঠি তার শরীরে লাগছে না, হাতে লাঠি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঘুরে মার ঠেকিয়ে দিচ্ছে।

ফটিক ডাকল, "নিতাই, ঠিক আছিস?"

নিতাই একটু দূর থেকে বলল, "ঠিক আছি। তোর কী খবর?"

ফটিক বলল, "খবর বেশ ভালই। আমি যে এত ভাল লেঠেল কখনও টের পাইনি তো!"

নিতাই বলল, "আমিও পাইনি। চালিয়ে যা।"

ফটিক লাঠির ঘায়ে একজনকে ধরাশায়ী করে চেঁচিয়ে উঠে নিজেকেই বাহবা দিল, "সাবাস।"

নিতাই বলল, "কী হল রে?"

"একটাকে ফেলেছি।"

নিতাই বলল, "ধুস। আমি তিনটেকে ঘায়েল করলাম।"

ফটিকের ভয়-ডর কেটে গিয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছিল। সে গুন গুন করে ধরাশায়ী করে বলে উঠল,"নিতাই তোর কটা হল?"

"এই যে চার নম্বরটাকে ফেললাম।"

"চালিয়ে যা।"

ঠকাঠক ঠকাঠক লাঠির শব্দ হতে লাগল। সেই সঙ্গে ফটিকের গান আর প্রতিপক্ষদের মাঝে মাঝে "বাবা রে! মা রে! গেলুম রে।" বলে চিৎকার। নিতাইয়ের লাঠি খেয়ে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল,'খুন... খুন করে ফেলল! বাঁচাও ... বাঁচাও..."

ফটিক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "এঃ, লোকগুলো একেবারে আনাড়ি দেখছি!"

সাত

কন্ধকাটাদের মুণ্ডু না থাকলেও তাদের কোনও অসুবিধে হয় না। শোনা যায় তাদের চোখ নাক কান সবই থাকে তাদের বুকে। বাঁশবনের দুই কন্ধকাটা দাবা খেলে খেলে ক্লান্ত হয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল। গাছে গাছে মগডাল থেকে মগডালে ঝুল খেয়ে খেয়ে তারা মনসাপোতার জঙ্গলে এসে একটা গাছ থেকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে জিরোচ্ছিল। তখন কন্ধকাটা ক কন্ধকাটা খ-কে বলল, "ওই দ্যাখ, ভুঁড়ি যাচ্ছে।"

কন্ধকাটা খ বলে, "কার ভুঁড়ি?"

"গজপতি দারোদার ভুঁড়ি।"

"তা গজপতি দারোগা কোথায়?"

"ভুড়ির পেছনে পেছনে আসছে।"

"ও বাবা, সন্ধের পর গজপতি দারোগা আজ বেরোল যে! এ তো ঘোর দুর্লক্ষণ? দেশে অনাবৃষ্টি, মহামারী, ভূমিকম্প কিছু না-কিছু হবেই।"

"হুঁ। সন্ধের পর গজপতিকে কেউ ঘরের বাইরে দেখেনি বটে। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ আছে।"

"থাকতেই হবে।"

"আয় তবে, মজা দেখি।"

কন্ধকাটা খ হঠাৎ বলল, "ওরে দ্যাখ, দ্যাখ, গড়াইবুড়ি তার বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!"

কন্ধকাটা ক-ও ভারী অবাক হয়ে গিয়ে বলে, "অ্যাঁ! তাই তো! এ যে খুবই অলক্ষুণে কাণ্ড! দেশে কি শেষে মড়ক লাগবে?"

কন্ধকাটা খ হাঁক দিয়ে বলল, "বলি ও গড়াইবুড়ি, বলি যাও কোথা?"

গড়াইবুড়ি একটা শিমুল গাছের মগডালে ডান পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে কী দেখছিল, কন্ধকাটাদের দেখে লজ্জা পেয়ে বলল, "পেন্নাম হই বাবাঠাকুরেরা। ছোড়াদুটোকে খুঁজছি।"

"কোন ছোঁড়াদুটো?"

"আর বলবেন না বাবাঠাকুরেরা, দুটি পুষ্যি এসে জুটেছে। বোকার হদ্দ। ডান বাঁ চেনে না। সাঁঝের পর কোথায় বেরুল। বড্ড ভাবনা হচ্ছে।"

"তুমি তো বাপু নিজের বাড়িটি ছেড়ে কখনও নড়োনি আজ অবধি।"

"নড়ার কি জো আছে বাবা! ও বাড়ির ওপর যে সবার বড় কুনজর। পাহারা না দিলেই দখল করে নেবে।"

"শেষ অবধি কি মায়ার বন্ধনে পড়লে নাকি গড়াইবুড়ি। মরার পর কারও কি ও বালাই থাকে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গড়াইবুড়ি বলে, "সে তো আমারও ছিল না। ছোড়াদুটোর মুখ দেখে কী যে হল কে জানে! বড্ড ভাবনা হচ্ছে।"

"আহা ওসব ছেড়ে একটা মজা দেখবে এসো। ওই দ্যাখো গজপতি দারোগা রোদে বেরিয়েছে।"

কিন্তু গড়াইবুড়ি দাঁড়াল না। গাছে গাছে ডিং মেরে হাওয়া হয়ে গেল।

গন্ধকাটা ক আর খ মিলে মজা দেখতে লাগল। কিন্তু তারা মজা পেলেও গজপতি দারোগা মোটেই মজা পাচ্ছিলেন না। সন্ধের পর তিনি বাড়ির বাইরে পা দেন না। ভূতপ্রেত, চোর-ডাকাত, খুনে-গুণ্ডা, সাপখোপ ইত্যাদি নানা অস্বস্তিকর ব্যাপার এই সন্ধের পরই মাথাচাড়া দেয়। তার বহুকালের অভ্যাস হল সন্ধের পর এক বড় বাটি ভর্তি ক্ষীর, দুটি মর্তমান কলা, একধামা খই দিয়ে মেখে খেয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বসে লুডু খেলা। রাতে থানার কাজকর্ম সেপাইরাই সামলায়। আজ তাকে বেরোতে হয়েছে হেড কনস্টেবল রামভুজ পালোয়ানের পাল্লায় পড়ে। এ-কথা ঠিক যে, দোগেছেতে সতীশ দারোগা আসার পর থেকেই গজপতির বদনাম হচ্ছে। সতীশ দারোগা নাকি খুবই করিৎকর্মা, দুর্জয় সাহসী, তার দাপটে নাকি দোগেছেতে চুরি-ডাকাতি, খুনখারাপি বন্ধ। আর গজপতির এলাকায় নাকি অপরাধপ্রবণতা দারুণ বেড়ে যাচ্ছে। শোনা যায় সতীশ দারোগা বহুরূপী। কখনও পাগল বা সাধু, কখনও বা চোর কিংবা ডাকাত সেজে চোর-ডাকাতের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের ধরে। এমনকী বাঘ বা গাছ সেজেও নাকি সে জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকে। প্রায়ই খবর পাওয়া যায় সতীশ আজ চার চোরকে ধরেছে, কিংবা দশ ডাকাতকে। রোজই রামভুজ গজপতিকে এসে বলে, "বড়বাবু, আপনি সতীশ দারোগার চেয়ে কম কীসে? তবু সতীশ দারোগার এত নাম হয়ে যাচ্ছে!"

তবু এতকাল গজপতি গা করেননি। কিন্তু আজ রামভুজ যে খবর দিয়েছে তাতে স্থির থাকা যায় না। রামভুজ বলেছে, বড়বাবু, আপনার নাম ডোবাতে আজ সতীশ দারোগা আপনার এলাকায় ঢুকে কিছু বদমাশকে ধরে নিয়ে যাবে বলে খবর আছে। এতে তো আপনার খুবই বদনাম হবে। আপনার চোর-ডাকাত যদি সতীশ দারোগা ধরে তা হলে তো একদিন আপনার গদিতেই এসে বসে যাবে। আপনাকে হয়তো টুলে বসে থাকতে হবে।

এই কথা শুনে গজপতি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "এত সাহস সতীশ দারোগার? আমার চোর-ডাকাত ধরার সে কে? না না, কিছুতেই এই অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না।"

রামভুজ বলল, "শাবাশ হুজুর। তা হলে আজ সাঁঝের পর চলুন। পাকা খবর আছে আজ সতশি দারোগা মনসাপোতার জঙ্গলে ঢুকবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গজপতি রাজি হলেন। কিন্তু রাজি হয়ে যে কী ভুলই করেছেন তা এখন পদে পদে বুঝছেন। প্রথম কথা, মনসাপোতার জঙ্গল অতি বিচ্ছিরি জায়গা। খানাখন্দে ভরা, কাঁটাওলা আগাছায় ভর্তি, শেয়াল, পাঁচা, নানারকম জীবজন্তুর আস্তানা, সাপখোপের ভয় তা ছাড়া তিনি হাঁটতে পারেন না তেমন। এই বিচ্ছিরি জঙ্গলে হাঁটাহাটি করতে গিয়ে তিনি হাঁসফাঁস করছেন। ঘামে সর্বাঙ্গ ভেজা।

গজপতি বললেন, “এ কোথায় এনে ফেললে হে রামভুজ ?”

“চুপ হুজুর। বাতাসেরও কান আছে। সতীশ দারোগা যে কোথা দিয়ে কোন ছদ্মবেশে ঢুকবে তার কোনও ঠিক নেই। মনসাপোতার মোড়ে আমাদের সেপাইরা মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু তাদের চোখে ধুলো দেওয়া সতীশ দারোগার কাছে জলভাত। বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, আমাদের সেপাই বিরিঞ্চি একবার ভুল করে সতীশ দারোগাকে নিজের শ্বশুর ভেবে পেন্নাম করে ফেলেছিল।”

গজপতি একটা হুঙ্কার দিলেন, “বটে। তা হলে তো বিরিঞ্চিকে বরখাস্ত করা উচিত।”

“সেইজন্যই তো হুজুর, আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আর যার চোখকে ফাঁকি দিক, আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়া তো সোজা নয়।”

গজপতি ঘাড় থেকে একটা শুয়োপোকা ফেলে দিয়ে জায়গাটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “আমার শ্বশুর সেজে এসে আমাকে ঠকানো অত সোজা নয়। আমার শ্বশুরকে আমি বিলক্ষণ চিনি। তিনি ফোকলা, ট্যারা, নুলো আর টেকো। কিন্তু কোথায় সেই ব্যাটা?”

“আসবে হুজুর, এই পথেই আসবে। একটু নজর রাখুন।”

হঠাৎ গজপতি বলে উঠলেন, “আচ্ছা গাছের ওপর থেকে কে একজন হেসে উঠল বলো তো!”

রামভুজ বলল, “রাম রাম। আমিও শুনেছি হুজুর। ওসব না শোনার ভান করে থাকুন। মনে হচ্ছে বাঁশবনের কন্ধকাটা দু’জন।”

“চুপ, চুপ হুজুর! কে যেন আসছে।”

জঙ্গলের সরু পথ ধরে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছিল। গজপতি এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, “না, না সতীশবাবু, কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এটা আমার এলাকা, আমার আশ্রিত সব চোর-ডাকাতকে আপনি ধরার কে?”

টর্চ জ্বেলে যাকে দেখলেন গজপতি তাকে দেখে তিনি স্তম্ভিত। লোকটা দাঁড়ি-গোফওলা, ফোকলা, টেকো, ট্যারা এবং বাঁ হাতটা নুলো। লোকটা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “গজপতি বাবাজীবন নাকি?”

“এ কী ! এ যে শ্বশুরমশাই!” বলে গজপতি গিয়ে তাড়াতাড়ি শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে একগাল হেসে বললেন, “কখন এলেন?”

“এই সন্ধেবেলাতেই এসেছি বাবা। এসে শুনি তুমি নাকি চোর-ডাকাত ধরতে বেরিয়েছ। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ! এসব কি তোমার সহ্য হয় বাবা? শুনেই তো আমি আর থাকতে না পেরে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি। চোর-ডাকাত যাদের ধরার তারা ধরুক তো। তুমি বাড়ি চলো। তোমার জন্য পরোটা আর মাংস রান্না হচ্ছে।”

গজপতি লজ্জার সঙ্গে মৃদু হেসে মাথা নিচু করে বললেন, “ও কিছু নয়। সামান্য কয়েকটা ছিচকে চোর আর আনাড়ি ডাকাতরা একটু গণ্ডগোল করছিল।

তা বলছেন যখন, চলুন। তুইও চলে আয় রে রামভুজ।"

শ্বশুরমশাই বললেন, "চলো বাবা, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।"

কয়েক পা যাওয়ার পরই পেছন থেকে রামভুজ বলল, "বড়বাবু, আপনার শ্বশুরমশাই কোথায় গেলেন?"

"তার মানে ?"

"উনি তো বিলকুল গায়েব।"

পেছনে টর্চ ফোকাস করে গজপতি অবাক হয়ে বলেন, "তাই তো। শ্বশুরমশাই গেলেন কোথায়?"

রামভুজ বলে, "উনি মোটেই আপনার শ্বশুরমশাই নন। ওই লোকটাই সতীশ দারোগা।"

"বলিস কী? দ্যাখ দ্যাখ, কোনদিকে গেল!"

চারদিকে খুঁজেও লোকটাকে পাওয়া গেল না।

গজপতি দুঃখ করে বললেন, "একটু সন্দেহ আমারও হচ্ছিল। লোকটা যেন ঠিক ফোকলা নয়, কালো কালো দাঁতের মতো কী যেন দেখা যাচ্ছিল মুখে। আর নুলো ভাবটাও যেন ইচ্ছে করে করা। টাকটাও যেন কেমন সন্দেহজনক।"

গাছের ওপর থেকে ফের চাপা হাসির শব্দ শুনে গজপতি কাঁপা গলায় বললেন, "কে?"

দু'জনে দৌড়ে খানিক তফাত হলেন। গজপতি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "রামভুজ, এক রাত্তিরের মতো অনেক হয়েছে বাবা। এবার বাড়ি চল।"

"আপনার নাম যে খারাপ হয়ে যাবে বড়বাবু।"

এই সময়ে হঠাৎ সামনের দিকে খটাখট করে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,"খুন! খুন করে ফেলল। বাঁচাও,,, বাঁচাও..."

গজপতিবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, "কী, কী হচ্ছে বল তো!"

রামভুজ বলল, "খুনখারাপি কিছু হচ্ছে বলে মনে হয়।"

গজপতিবাবু সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "খুন! কক্ষনো নয়। আমার এলাকায় কস্মিনকালেও খুনটুন হয় না। যা দু-একটা লাশ পাওয়া যায় সেগুলো সব সতীশ দারোগার এলাকায় খুন করে আমার বদনাম করার জন্য এই এলাকায় ফেলে যায়।"

"তবু হুজুর, আপনিই তো এলাকার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। একটু এগিয়ে দেখে আসবেন চলুন।"

"পাগল নাকি? খুনটুন আমি একদম পছন্দ করি না। চোখের সামনে ওসব দেখলে রাতে আমার খাওয়াই হবে না। ঘুমেরও বারোটা বাজবে ও খুনটুন নয়, কেউ আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। চল, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই।"

হঠাৎ সামনের অন্ধকার থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বলল, "সেটা খুবই কাপুরুষের মতো কাজ হবে গজপতিবাবু!"

গজপতি টর্চ ফোকাস করে কাউকেই দেখতে পেলেন না। বললেন, “আপনি কে?”

“সেটা অবান্তর। দোগেছে থেকে দুটো নিরীহ ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে এনে এখানে খুন করার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্তত দশজন লাঠিয়াল তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। আর এদের পেছনে কে আছে জানেন? দুলুবাবু। দুলাল রায়।”

“ও বাবা! সে যে সাঙ্ঘাতিক লোক।”

“হ্যাঁ, খুবই সাঙ্ঘাতিক লোক। নটবর রায়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ওঁর মাথা গরম হয়ে গেছে।”

গজপতি একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “তা খুনটা হচ্ছে কেন?”

“কারণটা খুব সোজা। নটবর রায়ের ছেলেপুলে নেই। দুলাল রায়কে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন, কিন্তু দুলাল বড় হয়ে কুসঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে যায়। পনেরো বছর বয়সেই সে জেল খেটেছে। তাই নটবর রায় তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। নটবর রায় অবশেষে তাঁর স্ত্রীর ভাইপোকে সব লিখে দেবেন বলে পায়রাডাঙা থেকে আনিয়েছিলেন।”

রুমালে কপালের ঘাম মুছে গজপতি বললেন, “তারপর?”

“খবরটা পেয়েই দুলালবাবু নটবর রায়ের মাথা গুলিয়ে দেওয়ার জন্য পনেরোজন লোককে পর পর ফটিক ঘোষ সাজিয়ে ওঁর কাছে পাঠান। আসল ফটিক ঘোষের কাছ থেকে তার পিসির দেওয়া চিঠিটা লোপাট করেন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হবে না বুঝে ফটিককে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। ওই যে লাঠিবাজির শব্দ শুনছেন ওটাই হল সেই আয়োজন। আপনার উচিত ওখানে গিয়ে হাজির হয়ে দু’জনকে বাঁচানো।”

“ও বাবা! দুলুবাবুর সঙ্গে কি আমি পেরে উঠব? দশজন লেঠেলও রয়েছে যে!”

“কিন্তু আপনার কোমরে তো পিস্তলও রয়েছে।”

“পিস্তল! আমি জীবনে কখনও পিস্তল ছুড়িনি। ওর শব্দে আমার পিলে চমকে যায় যে !”

“তা হলে দুটো নিরীহ ছেলে কি আপনার চোখের সামনেই মরবো?”

“না, না, চোখের সামনে মরবে কেন? চোখের সামনে তো মরছে না! আমি তো কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। যা হচ্ছে তা চোখের আড়ালেই তো হচ্ছে।”

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। লোকটা বলল, “তা হলে আপনি সতীশ দারোগাকে টেক্কা দেবেন কী করে?”

“ওসব মরাটরা যে দেখতে আমি পছন্দ করি না। ওসব দেখলে আমার খাওয়ায় অরুচি হয়, ঘুম হতে চায় না। কিন্তু আপনি কে বলুন তো?”

“আমিই সতীশ দারোগা।”

“অ্যাঁ! না, না সতীশবাবু, এটা আপনার ঠিক হচ্ছে না। দেশে আইন আছে, নিয়ম আছে, ভদ্রতাবোধ আছে। আপনি আমার এলাকায় ঢুকে সেসবই যে

লঙ্ঘন করছেন। এটা কি ভাল হচ্ছে সতীশবাবু?"

"একটু আগেই আপনি আমাকে আপনার শ্বশুর ভেবে প্রণাম করেছেন। যে লোক নিজের শ্বশুরের সঙ্গে অন্য লোককে গুলিয়ে ফেলে সে অতি অপদার্থ লোক।"

কথাটা গজপতি একটু ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল, সতীশ দারোগা খুব একটা ভুল কথা বলেনি। তিনি একটু ঘাড় চুলকে বললেন, "তা আপনি যখন আমার এলাকায় ঢুকেই পড়েছেন তখন আপনিই বা কেন ছেলে দুটোকে মরতে দিচ্ছেন?"

সতীশ দারোগা বলল, "মরতে দিতুম না, যদি না একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেতুম। আপনিও দেখতে পারেন। কোনও ভয় নেই। এগিয়ে আসুন।"

"কিন্তু মরা টরা—"

"আসুন না। এলেই দেখতে পাবেন।"

"আয় রে রামভুজ।" বলে পায়ে পায়ে গজপতি দারোগা এগিয়ে গেলেন। শিবমন্দিরের চাতালে তখন আটটা লোক পড়ে আছে। আর দু'জন মুশকো চেহারার লোক দুটো রোগাভোগা ছেলের সঙ্গে লাঠালাঠি করছে। টর্চের আলো জ্বালতেই স্পষ্ট দেখা গেল ছেলে দুটোর হাতে লাঠির বেদম মার খেতে খেতে লোক দুটো টলছে। তারপর দমাস দমাস করে দু'জন পড়ে গেল।"

অন্ধকার থেকে সতীশ দারোগা বলল, "লড়াই শেষ।"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

দোগেছে থানার দারোগার ঘরে রাত দশটার সময় দৃশ্যটা এরকম: একখানা লম্বা বেঞ্চের একধারে বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়সের একজন লোক ঘাড় এলিয়ে বসে আছে। বেশ তাকতওয়ালা চেহারা, তবে এখন তার মাথা ফেটে জামা রক্তে ভেজা, বাঁ হাতটা ভাঙা বলে কোনওক্রমে একটা ন্যাকড়া দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। ইনিই দুলাল রায়। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছেন, দেখে নেব, দেখে নেব। তবে গলার স্বর ভাল ফুটছে না। তাঁর বাঁ পাশে জনাচারেক লেঠেল বসে "উঃ আঃ বাবা রে মা রে" বলে কাতরাচ্ছে। সকলেরই গায়ে কালশিটে, মাথা ফাটা বা হাত-পা ভাঙা। কয়েকজন মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দড়িতে বাঁধা রসিক বৈরাগী।

দারোগার উলটোদিকে নটবর রায়, তাঁর পাশে বঙ্গসুন্দরী দেবী, তার পাশে ফটিক ঘোষ, তার পাশে নিতাই, নিতাইয়ের পাশে গজপতিবাবু। বঙ্গসুন্দরী দেবী ফটিকের পিঠে হাত বোলাতেবোলাতে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। দারোগাবাবু তাঁর দিকে একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই আপনার সেই চিঠি।"

বঙ্গসুন্দরী বললেন, “ও চিঠির আর দরকার নেই। ফটিক আমার দাদার লেখা যে চিঠি ওর পিসেমশাইয়ের হাতে দিয়ে যায় সেইটে পড়েই বুঝতে পারি যে, এই আমার আসল ফটিক। চিঠিতে দাদা আমাকে পাঠ লিখেছিল ‘স্নেহের কুনু’ বলে। কুনু নামে একমাত্র দাদাই আমাকে ডাকত, আর সবাই ডাকত পুতুল বলে। ওই চিঠি পড়েই আমি ওঁকে বলি, ওগো, এই ছেলেটাই আমার ফটিক।”

হঠাৎ নটবর রায় বললেন, “ফটিক আর নিতাই দু’জনই আমার কাছে থাকবে। ফটিক সম্পত্তি পাবে, নিতাইকে ম্যানেজার করে দেব। কিন্তু দুলু কোনও গণ্ডগোল করবে না তো সতীশবাবু?”

সতীশ মাথা নেড়ে বললেন, “না, দুলুবাবুর বিরুদ্ধে চারটে প্রমাণিত খুনের মামলা আছে। আর আজকেরটা নিয়ে আছে তিনটে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। ফাঁসির দড়ি ওর কপালে নাচছে।”

সতীশ দারোগা ফটিক আর নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, “তোমরা লাঠিখেলা কোথায় শিখলে?”

ফটিক আর নিতাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। ফটিক বলল, “জীবনে কখনও লাঠিখেলা শিখিনি।”

“তা হলে কী করে এসব হল? দশ-বারোজন লেঠেলের সঙ্গে লড়লে কী করে?”

নিতাই চাপা গলায় বলল, “গড়াইঠাকুমা।”

সতীশ দারোদা মৃদু হেসে বললেন,“আমারও তাই মনে হয়েছিল।”

ফটিক বলে ওঠে, “কিন্তু আপনি সতীশ দারোগা হলেও আপনি কিন্তু আমাদের নদিয়াদা।”

সতীশ দারোগা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, কখনও আমি নদিয়া চোর, কখনও গজপতিবাবুর শ্বশুর, কখনও বাঘ, কখনও সাধু কত কী যে হতে হয় আমাকে!”

গজপতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, “আপনি আমার শ্বশুর নন ঠিকই। কিন্তু তাতে কী? দিন তো মশাই.আর-একবার পায়ের ধুলো দিন।”